KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : 28 চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৬
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title: সমকালীন (SAMAKALIN)	Size: 7"x 9.5" 17.78x24.13c.m.
Vol. & Number: ৩০/- ৩০/- ৩১/- ৩১/-	Year of Publication : বৈশাখ ১৩৮৯ ॥ May 1982 কার্তিক ১৩৮৯ ॥ Nov 1982 বৈশাখ ১৩৯০ ॥ May 1983 কার্তিক ১৩৯০ ॥ Nov 1983
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

সমকালীন : প্রবন্ধের পত্রিকা

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

একত্রিংশ বর্ষ ॥ বৈশাখ ১৩৯০

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

The lifeline that touches all our lives.

Indian Tube is Tubelectric.

Or why we think that, without us, the future of power generation in India would be pretty dim.

Let there be light. In every city, every town, every village.
It was one of the visions after India became independent.
But it was easier said than done. The job on hand was indeed of mammoth proportions.
Indian Tube has been an integral part of that process of our nation building.
By helping build our thermal power plants.
By playing a major role in the construction of our hydro-electric projects.
Unseen and unheard.
But very much there. Just like the veins and arteries of our bodies.

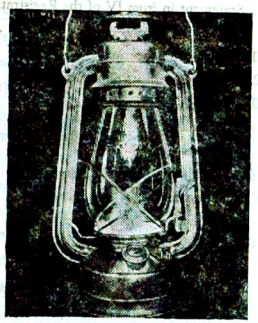

ITC INDIAN TUBE
Building lifelines.

ACIL/IT-6/82

Super Heater India
194/1/3 G. T. ROAD
SALKIA HOWRAH - 711 106

MANUFACTURERS OF V. B. CYLINDERS
PISTONRODS. SUPER HEATER ELEMENTS
Phone : 66-2064

একত্রিংশ বর্ষ ১ম সংখ্যা

স

বৈশাখ তেরশ নব্বই

সমকালীন ।। প্রবন্ধের পত্রিকা

সূচীপত্র

বৈদিক সৃষ্টির পরেই তো আয়ুর্বেদ ? ।। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর ৫

এলিয়াস কানেত্তি ।। বিজয় দেব ১১

শ্রীমতী ভিক্ষাইজী রুস্তম কামা ও সমকালীন প্রেক্ষাপট ।। আরতি গঙ্গোপাধ্যায় ১৬

চর্যাগানে রমণী সমাজ ।। রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী ২৯

সমালোচনা : প্যারী কমিউন ।। অধীর দে ৩৫

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক সুনীল প্রিন্টার্স, ২ ঈশ্বর মিল বাই লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-৮৭ হইতে প্রকাশিত।

'মনে করো, জুতো হাঁটছে
পা রয়েছে স্থির....

Bata understands shoes

সে বড়ো সুখের সময় নয়'

লেখক বলেন, আমরাও বলি।
কারণ, জুতোর সঙ্গে পায়ের
কোনরকম ঝগড়াই আমরা হতে
দিতে পারিনা। সেজন্যই আপনার
মনোমত, রুচিসম্মত, ফ্যাশানের
জুতোর জন্য সর্বদা বাটায় আসুন।

Bata

সমকালীন

বর্ষ ৩১ বৈশাখ ১৩৯০

বৈদিক সূক্তির পরেই তো আয়ুর্বেদ ?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর

স্বাধীন ভারতের কোন কোন সুধীমহলে প্রশ্ন ওঠে বৈকি, আজ যেমন করে 'সংস্কৃত ভাষার' সমৃদ্ধ গর্ভের রত্ন উদ্ধার করার একটা বিশেষ আগ্রহ, তেমনি কি ব্যগ্রতা জাগতো সংস্কৃত ভাষার সমাদর করার ব্যাপক প্রসারের যুগে বৈদিক ভাষার ভিতর কত অতীতের ভারতে কি ছিল ?১

মনে হয়, অজানাকে জানার আগ্রহ সর্বকালেই সমান, কিন্তু সে আগ্রহ তো কোন ভাষাকেই অবলম্বন করেই হয়। যদি যীশুর মত মহামানবের আবির্ভাব না হতো, তবে কি আমরা জানতে পারতাম বেদের পরিভাষা কত ধরনের ছিল ? আর মাংশের, পাণিনি প্রভৃতির উদয় যদি না হতো তা হলে কি আমরা সংস্কৃত ভাষার সূত্রেপথও ধরতে পারতাম। তবুও দীনতার সঙ্গে বলতে হচ্ছে, বেদের তথ্য আবিষ্কার তো বহু দূরে, সংস্কৃত ভাষাকেও সাধারণের কাছে আসতে দেওয়া হয়নি, কারণ সংস্কৃত ভাষা ছিল বর্ণাশ্রমবিধায়কদের গণ্ডী দেওয়ার মধ্যে।

এই গণ্ডীকে উপেক্ষা বা অপেক্ষা না করে পালি নামে একটি সংকর ভাষার প্রসার ঘটানর প্রয়োজন হয়েছিল বৌদ্ধ সংস্কৃতি প্রচারের যুগে। যা সর্বসাধারণের মুখের ভাষা, তারই আদর্শ ভাষা পালি ভাষা।

সেই যে সংস্কৃত ভাষার প্রতি অবহেলার যুগ শুরু হলো, তারপর থেকেই ভারতের প্রতিটি প্রদেশের মাতৃভাষার অবয়বগুলির সুষ্ঠু রূপ দান আরম্ভের যুগ। অতএব আজ আমাদের মাতৃভাষার মাধ্যমেই বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের রহস্য ও তথ্য আহরণের কৌতূহল একান্ত হয়ে উঠছে।

অল্প কয়েক বৎসর আগেও ছিল সংস্কৃত ভাষার প্রতি কেমন একটা ঔদাসীন্য, আর আজ তা

হয়েছে অবজ্ঞা অবহেলার ব্যাপার। মনে পড়ে এক সহপাঠীর জীবন কাহিনীর স্বল্পাংশ। বন্ধুটি তখনকার দিনে সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্র, একদিন বেশ উদাসী হয়ে স্কুল পাঠ্য পড়ছে সংস্কৃত ভাষার পঞ্চতন্ত্রের গল্প—দুরুম্ পসর্। বন্ধুটির পিতা তা শুনতে পেয়ে বুঝলেন সংস্কৃত ভাষার শুদ্ধাশুদ্ধ বোধই হয়নি, নইলে দুরমপসর এইটুকু বলতেও দুরুম্ পসর্ বলে? পুত্রের প্রতি বিরক্ত হয়েই বল্লেন, ওঠ্ যা আর তোকে সংস্কৃত পড়তে হবে না।

অতএব এই ইঙ্গিতেই বুঝতে হচ্ছে, আজ স্কুলের ছাত্রদের জন্য কেন সংস্কৃত ভাষাকে ঐচ্ছিক করা হয়েছে।

আজ এই দুর্দিনে যদি বহু দূরের বহু অতীতের বৈদিক সূক্তি মালার মধ্যে আয়ুর্বেদের অস্তিত্ব কেমন ভাবে গাঁথা আছে, তা জানতে ইচ্ছা হলে, স্বল্পায়াসে তা জানা যায় না। কারণ, বেদ শব্দটির সংস্কৃত ভাষায় অর্থ 'জ্ঞান'। বিদ্ জানে। এই যে জ্ঞান, তারই বা কি অর্থ? ঋক্‌বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ এবং অথর্ববেদ, এই চারটি বিশেষণ দিয়ে বলা হয়েছে, এরা বেদ। তাদের মধ্যে ঋক্ শব্দটি আধ্যাত্মিক দেবতাকে বিষয় করেই যে জ্ঞান, তার নাম ঋক্‌বেদ। এটি রচিত হয়েছে পদ্য করে। ঋক্ এর অন্য মানে স্তব ও পূজা।

আর যজুঃ শব্দের অর্থ কর্মকাণ্ড, এর রচনা গদ্যে। সাম শব্দের অর্থ গানের মাধ্যমে উপাসনা, এবং তা গীতিকাব্য অবলম্বন করে। এদেরই একত্র করে সংক্ষেপে বলা হয় ত্রয়ী বা ত্রয়ীবেদ।

চতুর্থটির নাম অথর্ববেদ। এই বেদটি রচিত হয়েছে পূর্বোক্ত তিন প্রকার বিষয়ের সমন্বয় সাধন করে যে জ্ঞান, অর্থাৎ জ্ঞান, কর্ম ও উপাসনার সমাবেশ। তাছাড়াও এর বিস্তৃত অংশটি মানব জীবনের যাবতীয় খুটিনাটি নিয়ে আলোচনা এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির উল্লেখ প্রচুর।

এইজন্যই একশ্রেণীর আচার্যগণ মনে করেন আয়ুর্বেদের উৎস অথর্ববেদ। এবং বেদের 'উপাঙ্গ আয়ুর্বেদ'। আবার আর এক শ্রেণীর আচার্যগণ মনে করেন ঋক্‌বেদেরই উপাঙ্গ আয়ুর্বেদ। এই দুটি মতবাদের মধ্যে সুশ্রুতের বক্তব্য 'আয়ুর্বেদ শাস্ত্র' অথর্ব বেদেরই, উপাঙ্গ। উপাঙ্গ শব্দটি একটি পারিভাষিক শব্দ। এর বিশেষ অর্থ নিকটবর্তী মুখ্যভাগ, কারণ মানবজীবনের অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য অথর্ববেদেই পাওয়া যায়। এ মন্তব্য চরকসংহিতা ও সুশ্রুত সংহিতা উভয়েরই। চরকের সূত্রস্থানের ৩৩ অধ্যায়ে 'চতুর্ণাং ঋক-সাম-যজুরথর্ববেদানাং অথর্ববেদে ভক্তিঃ আবেক্ষা'।

সুশ্রুতে বলা হয়েছে 'ইহ খলু আয়ুর্বেদমষ্টাঙ্গমথর্ব বেদস্য (সুশ্রুত সূত্রস্থান—১), এছাড়া ঢের পরে রচিত কাশ্যপ সংহিতার সূত্র স্থানের প্রথম অধ্যায়েও দেখা যায় ঋক্‌বেদ-যজুর্বেদ-সামবেদ-অথর্ব বেদভ্যঃ পঞ্চমো অয়ম্ আয়ুর্বেদঃ।

চরক সংহিতায় আয়ু শব্দটি কয়েকটি পর্যায় (সমার্থ বোধক শব্দ) বাকী শব্দের অন্তর্ভুক্ত—অর্থাৎ চেতনা, অনুবন্ধ, জীবিতানুবন্ধ, ও ধারী। আবার আর এক ভাষায় বলা যায়—যে কোন প্রাণীর শরীর, ইন্দ্রিয়, মন এবং আত্মা যতদিন একত্র থাকে, ততদিনই আয়ু শব্দের ব্যাপ্তি। একটির বিচ্ছেদ হলেই আর তিনটির বিচ্ছেদ, আর আয়ুর প্রসঙ্গও তখন থাকে না। এই চারটির সমন্বয় জানার নামই 'আয়ুর্বেদ'। অর্থাৎ আয়ুকে জানা। যেহেতু বেদ মানে জ্ঞান। এ অভিমত চরকও সুশ্রুত উভয়ের।

বেদের উপাঙ্গ বললে শুধু আয়ুর্বেদই বুঝতে হবে, তাও একক নয়, বেদের উপাঙ্গ মানে ধনুর্বেদ, গান্ধর্ববেদ, স্থাপত্যবেদ এবং আয়ুর্বেদ। তবে বেদের যে বিভাগগুলি আছে তাদের মধ্যে কোন্ বিভাগের উপাঙ্গ আয়ুর্বেদ এমন নিরূপণ অন্ততঃ প্রথম তিনটি বেদ থেকে বেরকরা যায়না, কারণ প্রত্যেক বেদেরই গাথাগুলিতে আয়ুর্বেদের বক্তব্য রয়েছে দেখা যায়। তবে পণ্ডিতরা দেখেছেন উপাঙ্গ শব্দের যা বক্তব্য, তা অথর্ববেদেই বেশী।

ঋক্ বেদের ১০টি মণ্ডল, এবং ১০২৮টি সূক্ত আর মন্ত্র আছে ১১০০০টি। পাঁচটি শাখা শাকল, বাষ্কল, আশ্বলায়ন, সাংখ্যায়ন এবং মাণ্ডুক্যায়ন। শেষেরটির অপর নাম ব্রাহ্মণ ও, ঋকের ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদও আছে।

যজুর্বেদ সংহিতা। (সংহিতা মানে কমপাইলেসান) এই সংহিতাটির দুটি ভাগ। কৃষ্ণ যজুর্বেদ এবং শুক্ল যজুর্বেদ। প্রথমটির বক্তা বৈশম্পায়ন। দ্বিতীয়টির যাজ্ঞবল্ক। বৈশম্পায়নের ছাত্রদের আর এক নাম চরক। অর্থাৎ এঁরা যাযাবর হয়ে থেকেই গুরুর কাছে জ্ঞান লাভ করতেন। শুক্ল যজুর্বেদটি কেবল মাত্র সংগ্রহের সম্পুট।

শুক্ল যজুর্বেদের দুটি শাখা কাণ্ব এবং মাধ্যন্দিন। আর ব্রাহ্মণের নাম শতপথ, এবং আরণ্যকের নাম ও শতপথ। উপনিষদ্ দুটি ঈশা-উপনিষদ্ এবং বৃহদারণ্যক।

কৃষ্ণ যজুর্বেদের ৪টি সংহিতা তৈত্তিরীয়, মৈত্রায়ণী, কাঠক এবং কপিষ্ঠল। উপনিষৎ তিনটি তৈত্তিরীয়, মৈত্রায়ণী এবং কঠ।

সামবেদ—এটির আর এক নাম ঋচ, ছান্দসী বা ছন্দসিকা। ৭৫ খণ্ড কেবল স্বতন্ত্র, বাকী সবই ঋক থেকে সংগৃহীত। তিনটি শাখা—কৌথুমী, জৈমিনীয় এবং রানায়নীয়। ৪টি ব্রাহ্মণ তাণ্ডা, ষড়্‌বিংশা, সামবিধান, এবং জৈমীনীয়।

আরণ্যক হলো ছান্দোগ্য এবং জৈমিনীয় আর উপনিষদ্ তিনটি ছান্দোগ্য, কেন এবং জৈমিনীয়।

অথর্ব বেদ। এর ২০টি কাণ্ড, তাদের আবার প্রপাঠক, অনুবাক এবং সূক্ত দিয়ে ভাগ করা আছে। শাখা হলো ২টি শৌনক ও পিপ্পলাদ। ব্রাহ্মণ একটি গোপথ। আর উপনিষদ্ দুটি—মুণ্ডক ও মালক্য।

এই অথর্ববেদেই একটি চমৎকার উপাখ্যান প্রসঙ্গে চিকিৎসক অশ্বিনী যুগলের কথা প্রসঙ্গটি সোমপান নিয়ে, বেদের আমলেই কিংবা বহু পূর্ব থেকেই চিকিৎসক দুজনের কাউকেই দেবতাদের পংক্তিতে বসিয়ে সোমপান করতে দেওয়া হতো না। কিন্তু কোন একসময়ে চ্যবন নামে এক ঋষির যৌবন পাইয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে ইন্দ্রের ক্রোধ হয়, ইন্দ্র তখন (দেবতাদের—রাজা প্রেসিডেন্টের নাম ইন্দ্র, বহু দেবতাই ইন্দ্র হয়েছিলেন) অশ্বিনীদের দেব পংক্তিতে সোম পান করার মর্যাদা বন্ধ করে দেন, পরে চ্যবন তার শ্বশুরকে দিয়ে যজ্ঞ করার পর, ইন্দ্রের রোষ আরও বাড়ে, তাতে চ্যবনও আরও উত্তেজিত হয়ে ইন্দ্রের প্রতি এমন অভিশাপ দেয় যাতে ইন্দ্রের ২টি হাতই স্তব্ধ হয়ে যায় (অথবা অববাহুক রোগ)। অবশেষে সেই অশ্বিনীকুমার দুজনেই চিকিৎসা করে, ও রোগ সারিয়ে দেন, বাধ্য হয়ে অশ্বিনীকুমারদের আবার সোমপানের মর্যাদা ফিরে আসে।

এমনি অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘটনার মাধ্যমেই চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রসঙ্গগুলি নিবদ্ধ হয়ে আছে। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে অশ্বিনীকুমারদের অর্থ কি চিকিৎসক না অন্য কিছু? এমন প্রশ্ন তুলেছেন বেদ ব্যাখ্যাকার যাস্ক—

প্রথম কথা—অশ্বিনীকুমার যুগল যমজ ভাই কিনা। এবং তাঁরা যে দেবতাদের সুখ দেবার জন্য নানান্ সামগ্রী জোগাতেন, এবং সর্বদা যুবকের মত থাকতেন এটা কতখানি সঠিক সংবাদ। তাছাড়া তাঁদের কৃতিত্ব ছিল অনেকদিক থেকে। চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতেন, এমনকি নতুন চোখও সংযোজন করে দিতেন, এক অঙ্গ বাদ দিয়ে সেই অঙ্গটির নতুন যোজনা করে দিতেন, আবার এমন বৈদিক সূক্তিও দেখা যায় ভুজ্যু নামে কোন রাজাকে সমুদ্রে ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।

এমন অদ্ভুতকর্মা চিকিৎসক অশ্বিনীকুমার যুগলের কথা কাহিনী বেদে থাকলেও যাস্ক কিন্তু 'অশ্বিনী' এই দ্বিবচনান্ত শব্দটির কয়েক প্রকার অর্থ করেছেন যেমন (১) আলো আঁধারী সময়ের নাম 'অশ্বিনৌ'। আবার (২) খুব ভোরে ও সন্ধ্যায় যে তারা দুটির প্রকাশ হয় তাদের নামও অশ্বিনৌ। জ্যোতিষগ্রহে অশ্বিনীকুমার মানে সমগ্র তারকারাশি। আবার মানবের শুভাশুভ অবস্থার নাম অশ্বিনৌ। হঠযোগ শাস্ত্রে বাম ও দক্ষিণ নাসাপুটে প্রবাহিত বায়ুর নামও অশ্বিনৌ—এদুটিকে ইড়া পিঙ্গলাও বলা হয়।

আবার এও দেখা যায়, প্রবল বায়ু বইলে যে সাঁ সাঁ আওয়াজ হয়, সেই বায়ুকেও অশ্বিন বলা হয়। তথাপি যাস্ক বলেছেন 'দেবচিকিৎসকৌ অশ্বিনৌ।

সেই অশ্বিনীনন্দন দু'জন একসঙ্গে কায়-চিকিৎসা ও শল্য শালাক্য চিকিৎসায় সুনিপুণ ছিলেন। সেইজন্য যিনি চিকিৎসা বিদ্যার উভয়ত্র জ্ঞানে বিজ্ঞ হতেন তাঁকে অশ্বিনী উপাধি দেওয়া হতো। চরক সংহিতার চিকিৎসা স্থানের শুভ অধ্যায়ের ৮র্থ শ্লোকে বলা হয়েছে হস্তি চিকিৎসকদের কেউ বিজ্ঞ হলে 'শালিহোত্র' এবং শল্য চিকিৎসার (সার্জারি) বৈদ্যকে ধন্বন্তরি এবং কায়চিকিৎসায় (মেডিকেলে) চরক অথবা অত্রি উপাধি দেওয়া হতো।

বেদের সূক্তিগুলিতে এমন কোন সূক্তি পাওয়া যায়না, যেগুলিকে বলা যাবে আজকের পাওয়া 'আয়ুর্বেদ সংহিতা'র এইটি আদিরূপ, চরক সংহিতা ও সুশ্রুত সংহিতা এবং কাশ্যপ সংহিতায় যেমন চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রায় পূর্ণাঙ্গতা রয়েছে তেমনটি বেদের কোথাও নাই।

যাঁরা বেদ চর্চা অব্যাহত রেখেছেন তাঁরা ভালো করেই জানেন, বর্তমান যুগে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র যেমন রোগের দূরবর্তি কারণ, রোগের বিশেষ কারণ সম্বন্ধে একটা ধারা সূত্র দিতে পারেন, চারটি বেদের কোন ভাগেই এসব তথ্য জানা যায়না। অর্থাৎ বেদ পড়লেও তিনি চিকিৎসা কার্য করতে পারবেন না, তার বদলে বলতে পারবেন, হ্যাঁ, আমাদের বৈদিক সূক্তির সংগ্রহ কালে এমন সব প্রাচীন নজিরের হদিস পাওয়া যায়, যেগুলি কায় চিকিৎসার ও শল্য শালাক্য চিকিৎসার যে প্রাচীন ঐতিহ্য ছিল, তার কাহিনী সব বেদেই অল্প বিস্তর আছে। এ সম্বন্ধে সেই ঐতিহ্যবার্তা গুলির কিছু সংগ্রহ করা হয়েছে—

ঋকবেদের ১/১৭৬/১৫ সূক্তে দেখা যায়—

আর্যরা যখন সংগ্রামে যেতেন, তাঁদের সঙ্গে যেতেন একশ্রেণীর হিতৈষী ব্যক্তি, পরবর্তীকালে

তাঁদের পরিচয় ওঁরা পুরোহিত। রাজার মঙ্গল কামনা করতেন, এবং সাংগ্রামিক বিঘ্ন উপস্থিত হলে যাদের সাহায্যে সে বিপদ মুক্ত হওয়া যায়, সঙ্গের সেই সাথিরা বা পুরোহিতরা তার উপায় নির্ধারণ করে দিতেন।

এই সূক্তে তেমনি একটি বিপদের সম্মুখীন হন রাজা। সঙ্গের সাথীটি দেখলেন রাজার পত্নী সেই যুদ্ধে একটি পা হারালেন। অমনি অশ্বিনীভাতৃযুগলকে আনার ব্যবস্থা করলেন। পুরোহিতের নাম অগস্ত্য এবং রাজার নাম 'খোক'। পত্নী বিস্পলা। দেবাচিকিৎসক অশ্বিনীকুমার আসতেই বল্লেন,

চরিত্রং হি বেরি বাচ্ছে'দি পর্ণভাজা খোকস্য পরিতকম্যায়াম্।
সদ্যো জংঘামায়সীং বিষ্পলায়ৈ ধনেহিতে তর্ত্তবে প্রত্যধত্তম্॥

অর্থাৎ হে ভিষক মহাশয় এই সংগ্রামে থেকে রাজার পত্নী বিস্পলার একটি পা কেটে গিয়েছে আপনি পাখীর পায়ের মত হাল্কা পা লোহার দ্বারা তৈরী করে জুড়ে দিন।

ঋকবেদের ১/১১৬/১৬ সূক্তে দেখা যাচ্ছে

ঋজ্রাশ্চ নামে মাননীয় ব্যক্তির পিতা, পুত্রের অবাধ্যতা দেখে শাপ দিলেন "তুমি অন্ধ হয়ে যাও।" অপরাধটা এই ধরনের, একটা নেকড়ে বাঘ বড় উপদ্রব করছিল, তাই বাড়ীর পোষা একটা ভেড়া ছিল, সেটাকে নেকড়ের সামনে ধরে দেয়। এতেই পিতার ক্রোধ। চোখ দুটি হারালো পিতার অভিশাপে। তৎক্ষণাৎ অশ্বিনীকুমাররা এসে নতুন করে চোখ বসিয়ে দিলেন।

এ সম্বন্ধে শল্য-শালক্য চিকিৎসার পদ্ধতি কিরকম ছিল, কোন বেদেরই কোন সূক্তিতে তা পাওয়া যায় না। অর্থাৎ সুশ্রুত সংহিতায় যে ভাবে ঐ পদ্ধতির বর্ণনা করা আছে, তা বেদে নাই।

তবে বলা যায় বেদের সূক্তিগুলিতে প্রার্থনামন্ত্র গুলি পাঠ করলে মনে হয় বৈদিক আমলে চিকিৎসার জন্য কোন অলৌকিক বা অবাস্তর পদ্ধতি ছিল না।

ঋকবেদে আরও কয়েকটি প্রসঙ্গের উল্লেখ দেখা যায়—তখনও স্পেশালিষ্টের সমাদর খুব, এবং তাঁরা নিপুণভাবে চিকিৎসা করতেন ঋকের দশম মণ্ডলের ১৬৪ অনুবাকের প্রথম সূক্তে বলা হয়েছে—

অক্ষীভ্যাং তে নাসিকাভ্যাং কর্ণাভ্যাং চুবুকাদধি।
……… মস্তিকাজ্জিহ্বয়াঃ বিবৃহামি তে॥

অর্থাৎ চিকিৎসক রোগীকে পরীক্ষা করে বলেছেন, তোমার দুটি চোখে কানে চিবুকে মাথার ভিতরে এবং জিহ্বায় যে শোষ রোগ দেখা দিয়েছে (কনজনসন) সেটি সেরে যাবে। এই মন্ত্রটি অথর্ববেদেও আছে।

ঋকবেদের ঐ মণ্ডলেরই ২য় সূক্তে বলা হয়েছে ওহে! তোমার যে স্নায়ু দাগগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে এই স্থাথনা তোমার ঘাড় শক্ত হচ্ছে, ঘাড়ের ওপরের অংশ কিছুদিনের মধ্যে আর নড়া চড়া ঘোরান যাবে না। অস্থি, অস্থি-সন্ধিগুলিও শুকিয়ে যাচ্ছে বিশেষকরে দুটি বাহু তো তুলতেই পারবে না।

গ্রীবাভ্যস্ত উষ্ণিহাভ্যঃ ঘীনসাভ্য অনূকয়াহৎ।
যক্ষং দোষাণ্য মংসাভ্যং বাহুভ্যাং বিবৃহামি তে॥

এই কন্‌জানসন রোগ যে প্রতিটি অঙ্গে হয়, সে সম্বন্ধে অথর্ববেদে আরও খোলাখুলি করে বলা আছে

অঙ্গে অঙ্গে লোম্নি লোম্নি যস্তে পর্বণি পর্বণি।
যক্ষং ত্বচস্য তব যং কশ্য পস্য বিবর্হেণ বিষ্বঞ্চং বিবৃংামসি।
উরুভ্যাং তে ষষ্ঠীবদভ্যাং পার্শিভ্যাং প্রপদাভ্যাম্।
যক্ষং ভসন্তং শ্রোণিভ্যাং ভাসদং ভংসসো বিবৃহামিতে ।। (অথর্ববেদ ২।৩৩।৫)

ঋকবেদে প্রসূতির রোগ ও রমণী দেহের বিশেষ বিশেষ স্থানে রোগগুলি বৈদিক পুরুষরা জানতেন, এমনকি গর্ভ হলেও যে নানান্ রোগে রমণীরা অশান্ত হন সে সম্বন্ধে ঋক বেদের (১০।১৬২।১—৪ সূক্তে বলা হয়েছে।

ঋক বেদের যুগে মনোরোগেও অনেকে ভুগতেন সে সম্বন্ধে ঋকের ঐ দশম মণ্ডলেই বলা হয়েছে—রোগের ২টি অধিষ্ঠান মন এবং শরীর। মনের বিকার হয় রজ গুণের বিকারে ও তমো গুণের বিকারে। কখনও আগেই মন রুগ্ন হয়, কখনও শরীরে রোগ প্রবেশ করার পর মনের বিকার হয়। ঋকবেদ ১০।১৩৭।৭ সূক্ত।

মনের রোগ সম্বন্ধে যজুর্বেদেও বলা হয়েছে ৩৪ অধ্যায়ে।

যারা বৈদিক সূক্তিগুলি নিয়ে গভীর অনুশীলন করেন, তারা দেখতে পাবেন, যেকালে ঋক, সাম ও যজুর প্রবর্তন, সেকালে কিন্তু অথর্ববেদের মত এত বিপুল তথ্যের আবিষ্কার হয়নি। এসবকে অথর্ব বেদের ভেষজ পরিচয়, তাদের গুণ পরিচয়, তাদের কর্ম পরিচয় অর্থাৎ কোথায় ভেষজগুলি প্রয়োগ করতে হয় তার বহু বিস্তৃত তথ্যের সমাবেশ অথর্ব বেদেই পাওয়া যায়। যার জন্য দীর্ঘকাল পরের রচনা চরক ও সুশ্রুত সংহিতা দুটিকে বলা যায় এ দুটি সংহিতা অথর্ববেদের সূক্তিগুলি ধরে অনুশীলনেরই ফল। যদিও অথর্ববেদে চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি। কিন্তু আজকের চরক সুশ্রুতে যত রকম ভেষজের নাম উল্লিখিত প্রায় পনর আনাই অথর্ববেদে উল্লেখিত। সুযোগ এলে অবশ্যই তার ফিরিস্তি দেবো। তাছাড়া বৌদ্ধ যুগেই যে আয়ুর্বেদকে ঢেলে সাজান হয়েছে সে নিদর্শন প্রচুর; এমনকি রামায়ণ-মহাভারতেও যে আয়ুর্বেদের প্রসঙ্গ তাও এসেছে বৌদ্ধ সংস্কৃতি থেকে।

এলিয়াস কানেত্তি

বিজয় দেব

যখনই কোন অপরিচিত লেখককে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হয় তখন বুঝতে হবে, এটুকু তাঁর সমগ্র জীবনের সাহিত্য-সাধনার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মাত্র। সেই সঙ্গে বিশ্বের সাহিত্য অনুরাগীদের মধ্যে তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহল ও উৎসাহের সঞ্চার হয়। সেই লেখক তখন আর নিজস্ব ভাষা বা সাহিত্যের পরিধিতে আবদ্ধ থাকেন না। অথচ সেই লেখকই ইতিপূর্বে স্ব-ভূমিতে অধিষ্ঠান করে সাহিত্যক্ষেত্রে গৌরব অর্জন করেছেন। প্রতীচ্যের প্রতিটি লেখকের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় জীবনের চরম অভিজ্ঞতার প্রান্তে এসে তাঁরা এক চিরায়ত দর্শন সাহিত্যে আবিষ্ট করে রাখেন। মানবিক প্রশ্ন মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। মুক্ত-মন নিয়ে সেই লেখক প্রশ্ন করেন "আপনি কে?' এই ধরণের প্রশ্ন বহন করে লেখক পরিণতির সীমায় এসে উপস্থিত হন। একটি নির্দিষ্ট জীবন-দর্শনও গড়ে ওঠে গভীর উপলব্ধি থেকে।

১৯৮১ সালের নোবেল পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত লেখক এলিয়াস কানেত্তি; তিনি নিতান্ত অপরিচিত। অথচ তাঁর রচনার চিরায়ত মানবিক প্রশ্নই সোচ্চার হয়ে ওঠেছে। ১৯০৫ সালের ২৫শে জুলাই দানিয়ুব তীরবর্তী রুশে শহরে এলিয়াস কানেত্তি জন্মগ্রহণ করেন। জন্মসূত্রে তিনি স্প্যানিশ ইহুদী। পিতৃপুরুষ একদিন রাজনৈতিক কারণে স্পেন ছেড়ে বুলগেরিয়ায় এসে বসবাস সুরু করেন। দু' বছর বয়সে কানেত্তিকে পিতার সঙ্গে দেশ ছেড়ে ইংল্যাণ্ডে আশ্রয় লাভ করতে হয়। কিছুদিন পর পিতার আকস্মিক মৃত্যু কানেত্তিকে স্তব্ধ করে রাখে। সেই থেকে নানা প্রশ্ন তাঁকে চঞ্চল করতে থাকে। মা তাঁকে নিয়ে ভিয়েনা-সুইৎজারল্যাণ্ড থেকে জার্মেনী পর্যন্ত ঘুরে বেড়ালেন। তখনই তাঁর শিক্ষাপর্বের সূচনা। একদিন মায়ের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও রসায়ন শাস্ত্রে গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করে শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কানেত্তির জীবনে কখনো নির্দিষ্ট কোন পেশা, বৃত্তি বা চাকরী ছিল না। জীবিকার প্রয়োজনে নানা কাগজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি ফরাসী, বুলগেরিয়া স্প্যানিস ও ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করেন। জর্মন ছিল তাঁর শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম।

১৯৩৪ সালে তিনি ভেনিশিয়াকে বিয়ে করেন। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সালে কানেত্তি হীরাকে জীবন সঙ্গিনী হিসেবে নির্বাচিত করেন। হীরা ও একমাত্র কন্যা সম্প্রতি বাস করেন জুরিখের বাসভবনে। কিন্তু কানেত্তি ১৯৩৮ সালে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করার পর থেকে লণ্ডনে একটি স্থায়ী আবাসও নির্মাণ করেন। এখন তাকে লণ্ডন ও জুরিখ এর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে হচ্ছে।

কানেত্তির তখন শৈশব। পিতা তার সম্মুখে তুলে ধরতেন রাশি রাশি নানা বিষয়ের বই। বিচিত্র সব তথ্য ও কাহিনী আকর্ষণ করে রাখতো কিশোর কানেত্তির মনকে। নানা প্রশ্ন ভীড় করতো তাঁর মনে। যুক্ত হয় বিজ্ঞানের ছাত্রের পর্যবেক্ষণ। সেই থেকেই সুরু হয় তাঁর যুক্তিবাদী মনের তীব্র অন্বেষণ। নৃতত্ত্ব তাঁর চেতনার অতি ঘনিষ্ঠ। সব মিলিয়ে তিনি সমভাবে আগ্রহবোধ করেন

ধর্ম, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, দর্শন এবং ইতিহাসে। প্রাচীন সভ্যতা যে মানুষের সংস্কৃতির উৎস তা বিশ্লেষণ করেন গবেষণাগারে। মিশর, ভারতবর্ষ, গ্রীস, রোম ও চীন এর অধ্যয়ন তাই বাদ পড়েনা কানেত্তির অধ্যয়ন থেকে।

ছোটবেলা থেকেই কানেত্তি জীবনের নির্মম বাস্তবকে প্রত্যক্ষ করে এগিয়েচলেছেন। পৃথিবীর হিংস্রতা বিদ্বেষ ও লোভ বারবার মানুষের শুভ শক্তিকে ক্ষতবিক্ষত করছে তা লক্ষ্য করেছেন বিস্ময় ও আতঙ্ক নিয়ে। কানেত্তির জীবনে 'জনতা' এক আশ্চর্য উপলব্ধির সংযোজন। ব্যক্তি মানুষের মতো জনতারও যে নির্দিষ্ট ও চিরাগত রূপ রয়েছে তা কানেত্তিকে আকর্ষণ করে। তিনি লুক করেন নিরীক্ষণ। পরিণতিতে তিনি অনুভব করেন—জনতার আশা আছে হতাশা আছে, ক্রোধ আছে—রয়েছে উত্তেজনা আর উন্মত্ততা।

ঔপন্যাসিক কানেত্তি আমাদের কাছে অপরিচিত। তাঁর প্রথম উপন্যাস Die Blendung (ইংরেজী সংস্করণ Auto-DaFe ও আমেরিকান অনুবাদ 'দি টাওয়ার অব্ বাবেল') এর প্রস্তুতি পর্বের সূচনা ১৯২৭ সালের ১৫ই জুলাই। 'প্যালেস্ অব্ জাস্টিস্' এর আগুন ও নব্বই জন লোকের হত্যার বিভীষিকা কানেত্তিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। সর্বত্র হত্যা, অরাজকতা। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা কোথাও নেই। এই ভাবনা বহন করে ১৯৩২ সালে কানেত্তির প্রথম উপন্যাস Die Blendung প্রকাশিত হল। কিন্তু বইয়ের কোন চাহিদা নেই। অবশ্য দীর্ঘদিন পর এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ হয়। টমাস মান সেই উপন্যাস পাঠ করে বলেছিলেন 'মানুষের অধঃপতন এবং অশুভ শক্তির এক নিখুঁত চিত্র।'

এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র ডঃ পিটার কিয়েন। কীয়েন চীন সভ্যতার একজন বিশেষজ্ঞ এবং গবেষক পণ্ডিত। তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে রয়েছে পঁচিশ হাজার গ্রন্থ। এইসব বই ছিল তাঁর জীবনের সর্বস্ব। বইয়ের সঙ্গে কখনো কখনো তিনি কথা বলতেন। মোটকথা বইয়ের জগতেই তিনি বন্দী। বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন। সমাজ থেকে নির্বাসিত। এমনকি নারী সম্বন্ধে তাঁর কোনদিন বিন্দুমাত্র কৌতূহল বা দুর্বলতাও দেখা যায়নি। কিন্তু প্রকৃতি একদিন কিয়েনের ওপরই চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করলো।

মধ্যবয়সে এসে কীয়েন নিজের আদর্শ বিসর্জন দিয়ে নিজের ঘরকান্নার পরিচালিকা থেরেজে ক্রুমভলৎসকে বিয়ে করে বসেন। স্বভাবে থেরেজে ছিল লোভী, অস্থিরমতী, বদরাগী এবং যৌনলিপ্সু। বস্তুত: এই বিবাহ থেরেজের জীবনে হতাশা নিয়ে এলো। সে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। কিয়েন তাকে স্ত্রীর ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন। তা সত্ত্বেও থেরেজে স্বামীর ব্যাঙ্কের পাশবুক অনুসন্ধান করে বেড়ায়। কোথাও নেই, কিয়েনের বই ঘাটতে গিয়ে তার পাণ্ডুলিপি পর্যন্ত অগোছালো হয়ে পড়ে। আশাভঙ্গের পরিণামে থেরেজে ক্রোধে ফেটে পড়ে। কিয়েনের কোট টুপি এমনকি ব্রিফকেস পর্যন্ত ছুঁড়ে ফেলে। কিন্তু ব্যাঙ্কের পাশ বুক তখন কিয়েনের নিজের পকেটে।

অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে ছিল প্রাক্তন পুলিশ ও বর্তমান কেয়ার টেকার ও পশু শক্তির অধিকারী বেনেডিক্ট পাফ; কুঁজো ও বামন লিও ফিশারলে। পাফ; ফিশারলে ও লোভী থেরেজে কিয়েনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। কিয়েন অসহায়। পাফের নিষ্ঠুরতার কোন তুলনা নেই। দরজার ক্ষুদ্র ছিদ্র

দিয়ে লক্ষ্য করে যদি কেউ এখানে প্রবেশ করে সেই মুহূর্তে সে তার কণ্ঠনালী চেপে ধরবে। অন্যদিকে ট্র্যাজিক চরিত্র পঙ্গু ফিশারলে অপরাধপ্রবণ জগতে আবর্জনাসদৃশ। ঘটনাচক্রে সে কিয়েনের অর্থ হস্তগত করে। সে স্বপ্ন দেখে একদিন সে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দাবাখেলোয়াড়ের সম্মান অর্জন করবে। তাকে অভ্যর্থনা জানানোর ব্যবস্থাও হবে। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস আমেরিকার উদ্দেশ্যে পালাবার সময় নিজের পতিতা পত্নীর কোন এক খদ্দেরের হাতে বীভৎসভাবে সে নিহত হয়। কিয়েন চরম অভিজ্ঞতা অর্জন করে মন্তব্য করেন "সমগ্র প্রাণীজাতির কুৎসিত ও নির্মমতা নারীজাতির মধ্যেই মূর্ত হয়ে উঠেছে; এবং তা লক্ষ্য করি মাকড়সার মধ্যে।" থেরেজের সঙ্গে পাফের সম্পর্ক রচিত হয়। যার ফলে কিয়েনের গ্রন্থাগারেই তারা প্রভুকে অগ্রাহ্য করে সঙ্গম কার্য সমাধা করে। তারপর প্রত্যাবর্তিত পিটারের আপন প্রিয় গ্রন্থাগারে আগুন লাগে, এমন কি সেই আগুনে কিয়েনও দগ্ধ হলেন। বস্তুত: তিনি যেন তখন জনতার আত্মার সঙ্গে নিজেকে বিলীন করে দিলেন।

এই রচনার বিশেষ দিক হলো অশুভ শক্তি ও মানুষের অধঃপতনের একটি নির্দিষ্ট আকৃতির গঠন। ডঃ কিয়েন সংস্কৃতির প্রতিনিধিস্থানীয় হয়েও পরিবেষ্টিত পরগাছার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন।

আদিম প্রবৃত্তি, লোভ, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা নির্মম তৃপ্তির সঙ্গে নিযুক্ত। মানুষের ব্যক্তিগত বিচ্যুতিই এসব রিপুকে ক্ষিপ্ত করে। তারাই মূলতঃ ধ্বংস বা প্রলয়ের পুরোহিত। বস্তুতঃ আমাদের মধ্যেই বাস করে এক প্রচণ্ড শক্তিশালী উত্তেজিত বন্য পশু। জনতাও সেই প্রভাব থেকে মুক্ত নয়।

'দি ডয়েস অব মাগাকেশ' এ কানেত্তি এক অদ্ভুত প্রকরণ ব্যবহার করেছেন। আতঙ্ক, যন্ত্রণা ক্ষিপ্ত উঠের আর্তনাদ, মানবিক রোগগ্রস্ত নারীর বিলাপ, অন্ধ ভিক্ষুকের কান্না উত্থিত হয়েছে বিটার-টেল্লার, 'দি নেভার-মাই, দি নেম-লিকার, দি কপস্-স্কালার, দি লঙ-চেঞ্জার, দি নেবো-স্পেলার, দি গড-স্কোয়াশার, দি মুন-কাজিন প্রভৃতি আরোও চল্লিশটি বিচিত্র প্রকৃতির চরিত্র থেকে। ময়কো পরিদর্শনের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ 'শ্রুতি সাক্ষ্য' পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কানেত্তি প্রসঙ্গতঃ মন্তব্য করেন :

I am not interested in grasping precisely a man know I am interested only in exaggerating him precisely"

'দি হিউম্যান প্রভিন্স' কানেত্তির সুদীর্ঘ ত্রিশ বছরের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত দিনলিপি। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের উপলব্ধি গবেষণা চিন্তা এই রচনায় প্রতিফলিত। এখানে কানেত্তি নানা বিষয়ের অবতারণা করেছেন—যেমন সাহিত্য, মনস্তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, তুলনামূলক ধর্ম, দর্শন। পারিপার্শ্বিক অবস্থা, মানুষের বিশ্বাস, স্বাধীনতা, মৃত্যু, হিটলার—হিরোসিমা ও কানেত্তির আত্মাকে আবিষ্ট করে রেখেছে।

নৃতত্ত্বের প্রতি গভীর অনুরাগ বশতঃ কানেত্তি কথনও বলে ওঠেন : I think I have truth itself in my hands. It is the mirage of the greater clarity of relatively simple condition."

'হিউম্যান প্রভিন্সের' উল্লেখযোগ্য অংশ অধিকার করে রয়েছে কানেত্তির ভারত অনুসন্ধান পর্ব। বিভিন্ন সময়ের এই সব গভীর ভাবনার নিখুঁত চিত্র ছড়িয়ে আছে এই রচনায়। কয়েকটি

উদাহরণ এখানে দেয়া হলো।

১৯৪৯ :

That horrible story of the Sultan of Delhi! One witneses a kind of compulsion of conscence and lets it all go down one's back; and suddenly one feels as though one were a murderer oneself; simply because one went along with it, because one did not immediately repulse it, energetically and with disgust. The worst thing, always, is history, and I must not escape it; the fact that history has actually kept getting worse forces me to be its anatomist, I slice about in its rotting body and I am ashmed of the profession that I myself have chosen.

১৯৭৫ :

বুদ্ধের পিতা কেমন দূরদর্শী ছিলেন? কাল পীড়া এবং মৃত্যুর সঙ্গে বুদ্ধের প্রথম দর্শনের হৃতমান অবস্থার স্বরূপই বা কি ছিল?

যদি বুদ্ধের শৈশবে তাঁর পিতা খেলার সাথীর মতো বৃদ্ধ, অসুস্থ, এবং মৃতপ্রায় মানুষকে (নৃত্যরতা কিশোরী রমণী এবং গায়ক) তাঁর পরিবেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করে রাখতেন হয়তো পরিস্থিতি ভিন্ন হতো।

১৯২৪ সাল :

বৌদ্ধধর্ম আমার মধ্যে মোটেই প্রত্যয় উৎপাদন করতে পারেনি। কারণ সে ধর্মে ত্যাগই সব কিছু অধিকার করে রেখেছে। মৃত্যু সম্বন্ধেও নির্দিষ্ট কোন উত্তর নেই। যেন এড়িয়ে যাওয়া। অবশেষে খৃষ্ট ধর্ম মৃত্যুকে মুখ্য স্থান দিয়েছে। সেখানে ক্রুশ ছাড়া আর কি হতে পারে? ভারতীয় ধ্যান ধারণায় সত্যি সত্যি মৃত্যু সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নেই, ভাবনা নেই। এজন্য কেউ বিরোধিতাও করেনি। অথচ জীবনের অর্থহীনতার অভিযোগ থেকে একমাত্র মৃত্যুই মুক্তিদান করতে পারে।

১৯৬৯ সাল :

মৃত্যুর মুখোমুখি যে সেই মর্মান্তিক মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করছে; বস্তুতঃ সেই নিজের হত্যাকারীকে রূপান্তর গ্রহণ করে কণ্ঠস্বরে আকুলতা যোগ করে সাহায্য প্রার্থনা করবে (রামায়ণ)।

মোটকথা 'হিউম্যান প্রভিন্স' কানেত্তির সতর্ক চেতনার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। তাঁর মন সেখানে সদা জাগ্রত। একজন ব্যক্তির সত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, রয়েছে প্রতিটি মুহূর্তে রচিত প্রতিটি বাক্য।

কানেত্তির 'ক্রাউডস অ্যাণ্ড পাওয়ার' এর বৃহৎ অংশ অধিকার করে রয়েছে মায়া এবং প্রাগৈতিহাসিক জীবনচর্যা। সভ্যতার গোপন চাবিকাটি রয়েছে, সেই জীবনধারায়! কানেত্তি অনুভব করেন "যতক্ষণ একজন লোক জানে যে তার দেশে প্রচুর উপহাসযোগ্য লোক রয়েছে, ততক্ষণই সে দেশ প্রেমের প্রেরণা অনুভব করে।"

১৯১৯ সালে প্রকাশিত 'ক্রাউডস্ অ্যাণ্ড পাওয়ার' কানেত্তির পূর্ণবয়স্ক জীবনের বিচিত্র ঘটনার

সংকলন।

১৯২৫ সালে প্রথম জনতা এবং শক্তি বা আদেশের ভাবনায় কানেত্তি আবিষ্ট হয়ে পড়েন। তারপর অবিরাম কুড়ি বছর ধরে চলেছে তাঁর পরিক্রমা।

কানেত্তি এই গ্রন্থে জনতার চরিত্র অতি নিখুঁত ভাবে অঙ্কন করেছেন শিল্পীর মতো। জনতা সতত ক্রমবর্দ্ধমান। জনতার মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই, সব সমান। জনতা গভীরতার অনুরাগী। সে সদা নির্দেশের প্রতীক্ষায় মুহূর্ত অতিক্রম করে চলে।

মূল বক্তব্য সমর্পিত আদেশে। যখনই কোন আদেশ পালিত হয় তখন সংযুক্ত তীব্র মন্তব্য। বা হুল সদৃশ বেদনা বর্জন করা হয়। আদেশ পালনের জন্যেই আমাদের জীবন। সেই সময় তীব্র যন্ত্রণাকে হেয়ালী প্রয়োগ করে সহজ করে তুলি, বস্তুতঃ আমাদের মনে এই ধরনের বহির্ভূত তীব্র জ্বালা আরোপ করা হয়। সাধারণতঃ আমরা অপরাধ এড়িয়ে গোপন আদেশ পালন করি। মোটকথা আমাদের সমগ্র অস্তিত্বই নিজস্ব প্রতারণার শিকার। ঘটনাচক্রে ঘাতকরা সুখী। তাদের যন্ত্রণা অবিরাম প্রবহমান।

কানেত্তি জনতার উৎস এবং মানসিক জগৎ নিয়ে নিরন্তর গবেষণা করেন। 'প্যালেস অব জাস্টীস' এ আগুন তো জনতারই কাজ, সুতরাং বিপ্লবই হোক আর ইতিহাসই হোক সর্বত্র জনতা সক্রিয়। সে প্রয়োজনে কাউকে প্রতিষ্ঠিত করে, কাউকে আবার আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করে। এই জনতার যে চিরন্তন রূপ তা সত্যিই জান্তব। কখনো আক্রমণ করে কখনো পালিয়ে যায়। ন্যায় অন্যায় বলে স্পষ্ট কিছু নেই। কানেত্তি দর্শন ইতিহাস থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে জনতার চরিত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন।

'কনসেন্স অব ওয়র্ডস্' এ যুদ্ধ ও হিটলারের বিভীষিকায় সর্বত্র আচ্ছন্নতা। কানেত্তি কোন শ্মশানের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন: "যেন আমরা সবাই কবেই মৃতদের পরাজিত করে রেখেছি। আমাদের মৃত্যুর পর বেঁচে থাকার মুহূর্তকে এক এক করে স্তূপীকৃত করে রাখতে চান বীরপুরুষগণ। স্বৈরাচারী ও সাধারণ মানুষ এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকে নিজেরই প্রয়োজনে।

'To be the last man to remain alive in the deapest urge of every real seeker after powez."

১৯৭৭ সালে প্রকাশিত 'দি টাঙ সেট ফ্রি' কানেত্তির আত্মজীবনী। মা মাতিলদা এই রচনায় সব ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন। তাঁর শিক্ষা জীবনের অন্তরঙ্গ অনেক চিত্র মাকে অবলম্বন করেই রচিত।

পরিশেষে লক্ষণীয় প্রতিটি গ্রন্থেই জনতা কানেত্তির চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে রেখেছে, আগুনের মধ্যে জনতা কখন মূর্ত হয়ে উঠেছে, অথচ আশ্চর্য কানেত্তিও অলক্ষ্যে জনতার সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেলেন; শুধুমাত্র পড়ে রইলো 'জাস্টিস্ অব্ প্যালেসের' বিধ্বংসী আগুন।

শ্রীমতী ভিক্ষায়জী রুস্তম কামা ও সমকালীন প্রেক্ষাপট

আরতি গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতীয় বিপ্লবের ইতিহাসে শ্রীমতী ভিক্ষায়জী রুস্তম কামার নাম নানা কারণে স্মরণীয়। কিন্তু অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দের মতো তাঁর নাম জনমানসে তেমন সুপরিচিত হয়ে ওঠার সুযোগ পায়নি। এর কারণ সম্ভবতঃ প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সম্বন্ধে বিশেষ কোনো সংবাদ সাধারণ লোকে জানতেন না। বহুর দশক পূর্বে রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীমতী কামার নামের উপর বিশেষ করে আলোকপাত করা হয়। এই প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের অনেকের কথা আমরা একেবারেই জানতাম না। অনেকের কথা অল্পই জানতাম, এবং যেটুকু জানত.ম, তা ছিলো ব্যক্তিমনের মাধুরী-মেশানো, উজ্জ্বলরূপে বর্ণিত অথবা অহুজ্জ্বলরূপে উপেক্ষিত। শ্রীমতী ভিক্ষায়জীকে (যিনি মাদাম কামা নামে সমধিক পরিচিত) বর্তমানে প্রায়শঃ Mother of Indian revolution বলে সম্মানিত করা হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের ভারতীয় প্রেক্ষাপটে তাঁর কথা বিশেষ করে ফুটে ওঠেনি কোথাও।

স্বভাবতঃ থেকে থেকে মনে যে প্রশ্নটি খোঁচা দেয় তা হল, এই অনীহার প্রকৃত কারণটি কী হতে পারে? কারণ হতে পারে, যে শেষ জীবনে মাদাম কামা রুশবিপ্লবের পক্ষপাতী হয়ে পড়েছিলেন বলে সমকালীন কমিউনিজম বিরোধী জাতীয় নেতৃবৃন্দ তাঁর কথা বেশী বলতে চাননি। কিন্তু এ যুক্তি তেমন ভারসহ নয়। সবচেয়ে বড়ো কারণ বলে যা মনে হয়, তা হ'ল জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের এই নেপথ্য অংশটি সম্বন্ধে গভীর অনুধ্যান বা ব্যাপক গবেষণা হয়নি। যেটুকু হয়েছে তাও chronology বা ঘটনা বিবরণীর সমাহার মাত্র। য়ুরোপের উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের সূচনায় যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, তার পাশাপাশি ঔপনিবেশিক ভারতীয় সংগ্রামের রাজনৈতিক তাৎপর্য খতিয়ে দেখে ঐতিহাসিক সত্যনিরূপণের চেষ্টা অদ্যাবধি সার্থকভাবে হয়নি। ফলে যে ফাঁকগুলি থেকে গেছে, তার মধ্যে মাদাম কামার জীবন ও কার্য বিবরণীও পড়েছে।

মাদাম কামা এমন একজন মহিলা, যাঁর বিচিত্র ব্যক্তিত্ব আত্মপ্রকাশ করেছে রাজনীতির জটিলতম ক্ষেত্রে, নির্ভয় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। অথচ যদি তিনি আজীবন ভারতে থাকতেন, তবে তাঁকে তাঁর এই বিশেষ ভূমিকায় দেখা যেতো কিনা বলা কঠিন। কোনো মানুষই এককভাবে অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে না। সমকালীন পরিবেশ বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয়, সব কিছুর মধ্য দিয়ে ব্যক্তির উত্তরণ ঘটে অসাধারণত্বের পর্যায়ে, মাদাম কামা যে সময়ে ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন, সে সময়টা য়ুরোপের পক্ষে অসম্ভব জটিলতাপূর্ণ এবং ভারতের পক্ষেও ঠিক তাই। সেজন্যই যে কাজগুলি তাঁরা করতে চেয়েছিলেন, তার উপযুক্ত পরিবেশ ছিলো তাদের চারপাশে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী শাসনের কেন্দ্রে বসে, এবং সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্রে যে রাজনৈতিক জাগরণ হচ্ছে, তার সম্বন্ধেও তাঁদের অভিজ্ঞতা ছিল প্রত্যক্ষ। এ জন্যই কেবল মাদাম কামা নয়, তাঁর

সহযোগী সাথীরা, শ্যামাজী কৃষ্ণ বর্মা, সর্দার সিং রাওজী রাণা, বিনায়ক দামোদর সাভারকর, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রত্যেকের সম্বন্ধেই বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন আছে।

১৮৬১ সালের ২৪ শে সেপ্টেম্বর বোম্বাই প্রদেশের এক পার্শী পরিবারে শ্রীমতী ভিক্ষায়জীর জন্ম হয়। ভারতের ইতিহাসে এই সালটিকে স্মরণীয় বৎসর বলে চিহ্নিত করা যায়, কারণ ভারতে তো বটেই, পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলে চিহ্নিত হয়েছেন এমন অনেক এ সময়েই জন্মগ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, মোক্ষগুন্দম্ বিশ্বেশ্বরায়া প্রমুখ সকলেই এই সালে জন্মেছেন। অবশ্য তাঁদের মধ্যে অনেকেই দেশবাসীর কাছে শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি পেয়েছেন, কিন্তু মাদাম কামার কথা বিশেষ কেউই বলেননি।

শ্রীমতী ভিক্ষায়জীর পিতা ছিলেন সোরাবজি ফ্রামজি প্যাটেল। এবং মাতা ছিলেন জায়জী সোরাবজি প্যাটেল। শ্রীপ্যাটেল তাঁর সম্প্রদায়ভুক্ত অনেকের মতোই ব্যবসায়ী ছিলেন। সে সময়ে বোম্বাই প্রদেশের পার্শী সম্প্রদায় অত্যন্ত অগ্রসর এবং রাজভক্ত সম্প্রদায় বলে পরিগণিত ছিলেন।

এই সম্প্রদায় থেকেই ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা দাদাভাই নৌরজী আসেন। দাদাভাই নৌরজী সে সময়ে পার্শী সম্প্রদায়ের বহুবিধ ব্যাপী সংকীর্ণ সংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মজীবনে যে নতুন প্রাণস্পন্দনের সূচনা করেন তাতে বহু নবীন পার্শী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি আকৃষ্ট হন এবং দাদাভাই এর সঙ্গে যোগ দিয়ে স্কুল কলেজ স্থাপন, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ইত্যাদি ব্যাপারে জড়িত হন। পূর্বে পার্শী সমাজে স্ত্রীলোকেরা পর্দানশীন ছিলেন এবং অন্যান্য অনেক সম্প্রদায়ের মতো এই সম্প্রদায়েও স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ রেওয়াজ ছিল না। এই অজ্ঞতা যে কোনো সম্প্রদায়ের পক্ষে যে কতো ক্ষতিকর, একথা দাদাভাই ও তাঁর সহযোগীরা তাঁদের ছাত্র-জীবন থেকেই প্রচার করতে থাকেন। ১৮৫৬ সালে এঁদের উৎসাহেই Students Literary and Scientific Society স্থাপিত হয় এবং এই Society-র ছাত্রীরা মেয়েদের শিক্ষা দেবার জন্য ছোটো ছোটো ক্লাস করেন। কালক্রমে এগুলিই পার্শী বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

শ্রীমতী ভিক্ষায়জীকে অবশ্য পর্দার আড়ালে থেকে জীবন কাটাতে হয়নি। তিনি বালিকা বয়সে আলেকজান্দ্রা পার্শী বালিকা বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেখেন। অবশ্য বিদ্যালয়গত পড়াশুনা তাঁর কতদূর ছিল সে সম্বন্ধে কোনো নথিপ্রমাণ নেই। তা ছাড়া তাঁর রাজনৈতিক বা সমাজ-সংস্কারমূলক কার্যকলাপও যে কতদূর বিস্তৃত ছিলো তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

সে সময়ে অর্থাৎ উনিশ শতকের সপ্তম দশকে ভারতে রাজনৈতিক বিক্ষোভ ক্রমশঃ দানা বেঁধে উঠছিল। তবে তখন পর্যন্ত এই বিক্ষোভ উত্তাল হয়ে ফেটে পড়েনি। মৃদু আন্দোলনের আকারেই তা সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ উচ্চশিক্ষিত জনসাধারণের, অর্থাৎ নগরবাসী ইংরেজী শিক্ষিত জনসাধারণের কাছে বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। অথচ এই বিদ্রোহ সাধারণ মানুষের মনে ব্যাপক বিক্ষোভ জাগাতে সমর্থ হয়েছিলো। সিপাহী বিদ্রোহ দমন করার পরও এই বিক্ষোভ নবজাগ্রত তরুণ সমাজের মনে ধীরে ধীরে প্রধূমিত হয়ে উঠছিল, তবে তা তখনও ফেটে পড়েনি। ইতিমধ্যে ১৮৮৫ সালে বোম্বাই শহরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়।

এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন A. C. Hume.

১৮৮৫ সালের আগষ্ট মাসের ৩ তারিখে শ্রীমতী ভিক্ষায়জীর বিবাহ হয়। তার স্বামী ছিলেন, রুস্তম. কে. আর. কামা, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কামা পরিবারের সন্তান, এবং প্রসিদ্ধ প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ খুরশেদজী আর কামার পুত্র, কর্মজীবনে রুস্তম কামা ছিলেন সলিসিটার, তার পরবর্তীকালে তিনি বম্বে ক্রনিকল পত্রিকায় ফিরোজশাহ মেহতার সহকারী হিসেবে যোগ দেন।

ভিক্ষায়জীর পরবর্তী জীবনের কার্যকলাপ দেখে স্বভাবতঃ মনে হয় প্রথম যৌবনে তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপের দিকে খুবই বেশী প্রবণতা ছিল। কিন্তু এ রকম কোনো কার্যকলাপের কোনো সংবাদ পাওয়া যায় না। অবশ্য তাঁর জীবনী সম্বন্ধে Jal Cooper তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন, তিনি নানা প্রকার সাংগঠনিক কাজে ব্যাপৃত ছিলেন এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁর উৎসাহের আতিশয্য দেখে তাঁর পিতামাতা তাঁকে তাড়াতাড়ি বিবাহ দিয়ে দেন। যখন শ্রীমতী ভিক্ষায়জীর বিবাহ হয়, তখন তিনি ২৪ বৎসরের তরুণী। সে যুগে এত বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থাকা একটু আশ্চর্যের বিষয় বলেই মনে হয়। তা ছাড়া আরো আশ্চর্যের বিষয় হ'ল তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপের আতিশয্য দ্যোতক বর্ণনা। ১৮৮৫ সালে বোম্বাই অঞ্চলে এমন কোনো রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ হয়নি যার সঙ্গে শ্রীমতী ভিক্ষায়জী বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন।

১৮৯৬ সালে বোম্বাই শহরে এক ভয়ংকর প্লেগ মহামারী দেখা দেয়। ১৮৯৬ এর আগষ্ট সেপ্টেম্বর মাস থেকেই এর ক্রমবর্ধমান ভয়াবহ অগ্রগতি সারা বোম্বাই শহরে এক আতঙ্কের সৃষ্টি করে। দিনে চার পাঁচ শত থেকে আরম্ভ করে ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে প্লেগ আক্রান্তদের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে প্রায় ৩০০০ এর উপর দাঁড়ায়। সরকার পক্ষের কাজে এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্বেগের সৃষ্টি করে এবং প্লেগ মহামারী থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য নানা ব্যবস্থাও নেওয়া হয়। এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে অবশ্য কিছু জানবার আগে বোম্বাই শহরের বস্তি অঞ্চলের ভয়াবহ অবস্থা যে কোনো শহরের পক্ষেই দুঃস্বপ্ন। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চালাঘরে এক একটি পরিবার বাস করে সেখানেই তাদের রান্নাবান্না, সন্তানের জন্ম এবং পূজাপাঠের দেবস্থান। সমুদ্র তীরবর্তী বলে অবশ্য জলের কোনো অব্যবস্থা নেই। মলত্যাগেরও কোনো ব্যবস্থা নেই। স্তূপীকৃত আবর্জনা ও দুর্গন্ধের মধ্যে হাজার হাজার শ্রমিক পরিবার দিনের পর দিন বাস করে। এদের পক্ষে সুস্থ থাকাটাই এক সমস্যা। তদুপরি প্লেগের মহামারী দমনের প্রথম কর্তব্যই হলো পরিচ্ছন্নতা। সরকার ডাঃ র‍্যাণ্ড এর নেতৃত্বে বস্তি অঞ্চলের লোকদের মধ্যে রোগপ্রতিরোধের জন্য একদল স্বাস্থ্য পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। এই পরিদর্শকগণ ঘরে ঘরে গিয়ে গৃহবাসীদের ব্যবহার্য গৃহস্থালীর জিনিসপত্র, গৃহদেবতার পট বা প্রতিমূর্তি সব কিছু পথে টেনে ফেলে দিয়ে পরিষ্কৃত করণের কাজে লাগে। সকলেই এমনকি মেয়েদের পর্যন্ত রাস্তায় নিয়ে এসে দুই হাত ও দুই পা জড়িয়ে দাঁড়াতে বাধ্য করা হয় এবং প্লেগ রোগের আক্রমণ হয়েছে কিনা দেখার জন্য নির্বিচারে তাদের অঙ্গ সন্ধিস্থল স্পর্শ করতে থাকে। ফলে সাধারণ লোক প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। এই ক্রোধের ব্যাপ্তি যে কতদূর পৌঁছেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেল দামোদর ও বালকৃষ্ণ চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয় যখন প্লেগ কমিশনার মিঃ র‍্যাণ্ড ও লেফ্‌টেন্যাণ্ট আয়ার্স্টকে পুনায় হত্যা করলেন। এই হত্যার পর চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয়ের ফাঁসি হয়। এই ফাঁসির ঘটনার পরে বিনায়ক

দামোদর সাভারকরকে 'মিত্র মেলা' স্থাপনে উৎসাহী করেছিল। নাসিকে প্রতিষ্ঠিত এই 'মিত্রমেলা' ১৯০০ সালে গঠিত হয় এবং পরে ১৯০৪ সালে 'অভিনব ভারত সংঘ' নামে বিখ্যাতি অর্জন করে।

বোম্বাই শহরে যখন ব্যাপক প্লেগের আক্রমণ চলছে, তখন সরকারী হাসপাতাল গুলির অবস্থাও ছিল খুবই খারাপ। দেখাশুনা, নার্সিং ও ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা ও ডাক্তারের অব্যবস্থায় বহু লোক মারা পড়ে। সেইসময় বোম্বাই এর পার্শী সম্প্রদায় ও অন্যান্য নাগরিকগণ একটি দেশীয় হাসপাতাল স্থাপন করেন। সম্ভ্রান্ত নাগরিক সম্প্রদায় এ কাজে অগ্রণী হয়ে আসেন এবং সিষ্টার নিবেদিতা কয়েকজন সেবিকা সঙ্গে নিয়ে সেবাকার্য করতে আসেন। শ্রীমতী কামা এই প্লেগ হাসপাতাল স্থাপনে অগ্রণী ছিলেন। এবং সম্ভবতঃ সেবাকার্যেও যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেন।

তিন বৎসর প্রচণ্ড প্রকোপের পর প্লেগ মহামারী শেষ হয়। ইতিমধ্যে ভারতীয় রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমশঃ জটিল আকার ধারণ করতে থাকে। প্রচণ্ড ইংরেজ বিদ্বেষ, যা র‍্যাণ্ড হত্যা এবং চ্যাপেকর ভাইদের ফাঁসিতে পর্যবসিত হয়েছিল, তার প্রভাব যুব সাধারণের উপর বিস্তৃত হতে থাকে। দাদাভাই নওরোজী প্রমুখ নরম পন্থীদের ব্রিটিশ আনুগত্য বজায় রেখে দেশে ডোমিনিয়ম স্ট্যাটাস বজায় রাখার আন্দোলন যুবমানসে আর দাগ কাটছিল না।

ইতিমধ্যে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা জুনাগড় স্টেটের দেওয়ানী ত্যাগ করে সপরিবারে লণ্ডন যাত্রা করেন এবং সেখানে গিয়ে অধ্যাপক মনিয়ের উইলিয়ম্‌সের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এ ছাড়া গ্রীক, ল্যাটিন এবং সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক হিসাবেও সুনাম অর্জন করেন। ইনি ছাড়াও ভারতীয় প্রবাসী বিপ্লবীদের অন্যতম সর্দার সিং রাওজী রানা ১৮৮৮ সালে ইংলণ্ডে ব্যারিষ্টারী শিক্ষা করতে যায়, কারণ র‍্যাণ্ড ও আয়ার্স্ট হত্যা মামলায় ভারতীয় উকিলরা চাপেকর ভাইদের পক্ষ সমর্থনে ইতস্ততঃ করছিলেন বলে তার মনে আকাংক্ষা জেগে ওঠে, ব্যারিষ্টারি পড়ে তিনি এই দেশমাতৃকার কাজে নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিদের রাজদ্বারে রক্ষা করবার চেষ্টা করবেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই, শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা, সর্দার সিং রাওজী রানা এবং শ্রীমতী ভিক্ষায়জী কামা কেউই ভারতে থাকা কালে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেননি। এমনকি সে সময়কার রাজনৈতিক আবহাওয়া এঁদের কাউকেই স্পর্শ করতে পারেনি। এমন হতে পারে তখনকার রাজনৈতিক পরিবেশ ছিল মোটামুটিভাবে ব্রিটিশ রাজের ন্যায়নীতি বোধের প্রশংসা সূচক। অথবা শ্রীমতী কামার পারিবারিক জীবনের ব্যর্থতা এবং তজ্জনিত মানসিক অস্থিরতা সাময়িকভাবে তাঁকে রাজনীতি নিরপেক্ষ করে রেখেছিল।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় শ্রীমতী ভিক্ষায়জী কামার পারিবারিক জীবনে এক বিপর্যয় ঘটে। স্বামীর সঙ্গে এই সময়ে তাঁর সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হয়ে যায়, অবশ্য আইনসঙ্গত বিবাহ বিচ্ছেদ তাঁদের হয়নি, তবু তাঁদের যৌথ-জীবনযাত্রা চিরদিনের মতো শেষ হয়ে যায়। ভগ্নস্বাস্থ্য ও বিপর্যস্ত মন নিয়ে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমতী কামা লণ্ডনে চলে যান চিকিৎসা ব্যপদেশে, তখন তাঁর বয়স চল্লিশ।

প্রৌঢ় বয়সে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী কামার জীবনে এই বিদেশ যাত্রার মাধ্যমে যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দেয় তার ফলেই যেন তিনি সীমাবদ্ধ পারিবারিক জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে বৃহত্তম জগতে ডানা মেলার সুযোগ পেলেন।

লণ্ডনে তাঁর চিকিৎসা শেষ হলে হয়তো তাঁকে ভারতবর্ষেই ফিরে আসতে হতো, যদি না শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে তাঁর দেখা হত। লণ্ডনে থাকাকালে তিনি লণ্ডন ইণ্ডিয়া সোসাইটির পক্ষে দাদাভাই নওরোজীর হয়ে কাজ করতে থাকেন। দাদাভাই তখন পার্লামেণ্টে নির্বাচনের জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন। শ্রীমতী কামা এই সময়েই আমেরিকাতেও যান। আমেরিকা থেকে ফেরার পর তিনি ইণ্ডিয়া হাউসে বিনায়ক দামোদর সাভারকরের কার্যকলাপে আকৃষ্ট হন এবং তাঁরই প্রভাবে সত্যকার বিপ্লবী পথের প্রতি আকৃষ্ট হন।

সাভারকর ১৯০৬ সালে সর্দার সিং রাওজী রাণার প্রদত্ত শিবাজী বৃত্তি নিয়ে লণ্ডনে আসেন। এর পূর্বেই শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা ১৯০৫ সালে ইণ্ডিয়ান সোসিওলিষ্ট পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং এই পত্রিকায় শ্যামজী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক চিন্তা সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ করতে থাকেন। শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা লণ্ডনে হোমরুল সোসাইটি স্থাপন করেন এবং এই সোসাইটির চারপাশে স্বাধীনতাকামী প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা ধীরে ধীরে জড়ো হতে থাকে। 'ইণ্ডিয়া হাউস' বলে একটি গৃহে এই সোসাইটির অধিবেশন হ'তো এবং এই ইণ্ডিয়া হাউস ছিলো বিপ্লবীদের প্রধান আশ্রয়স্থল।

১৯০৫ সালের ১০ই মে সর্বপ্রথম লণ্ডনে প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতি-বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয় শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার গৃহে। সে সভায় সভানেত্রত্ব করেন শ্রীমতী কামা। ১৯০৬ সালে সাভারকর লণ্ডন গেলে তাঁকে ৬৫ ক্রমওয়েল এভিনিউ, হাইগেট নর্থে অবস্থিত ইণ্ডিয়া হাউসের অধ্যক্ষ নিয়োজিত করেন শ্যামজী। সাভারকর অবিলম্বে ঐ বাড়ীতে তাঁদের নাসিক অভিনব ভারত সংঘের শাখা স্থাপন করে বৈপ্লবিক কাজের সম্প্রসারণে ব্রতী হন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত জাতীয়তাবাদী তরুণেরা ইণ্ডিয়া হাউসে সম্মিলিত হতেন। মাদাম কামাও তাঁদের সঙ্গে বিবিধ প্রচার সংগঠনমূলক কাজে ব্যাপৃত হলেন। এখানেই 'ফ্রি ইণ্ডিয়া সোসাইটি' স্থাপিত হয়। মাদাম কামা এই সোসাইটির পরামর্শদাত্রী নিযুক্ত হন।

উপরিউক্ত ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে দেখা যায় যে, শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা এবং মাদাম কামা উভয়েই ভারতে যতদিন ছিলেন, ততদিন স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন না তো বটেই, এ সম্বন্ধে যে খুব বেশী কৌতূহলী ছিলেন তারও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে লণ্ডনে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এই যে কার্যকলাপে তাঁরা জড়িয়ে পড়লেন, এর পটভূমিকা কি? স্বভাবতঃ মনে হয় এর পটভূমিকা বুঝতে হলে সমকালের ভারত ও ইংলণ্ডের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

ভারত ও ইংলণ্ডের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী, বিশেষ করে ভারতীয়দের ক্ষেত্রে। ধনতান্ত্রিক ইংলণ্ডে ব্যক্তিস্বাধীনতা বরাবরই সম্মানিত ও স্বীকৃত। তা ছাড়াও সমাজতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ইংলণ্ডে ঘটেছে ধনতন্ত্র বিকাশের সঙ্গেই। ইংলণ্ডে ভারতীয় ছাত্ররা এবং অন্য প্রবাসীরা যে মর্যাদা পেত, তা স্থানীয় ইংলণ্ডবাসীর চেয়ে কিছু কম নয়। স্বয়ং শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা মনিয়র উইলিয়মসের ছাত্র ও সহকর্মী হিসেবে যথেষ্ট সম্মানিত ছিলেন। হারবার্ট স্পেন্সারের মতো পণ্ডিতের সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। তাঁর স্মরণে একটি বিশেষ পারিতোষিক ও বক্তৃতা মালার ব্যবস্থা

করেছিলেন কৃষ্ণবর্মা। দাদাভাই নওরোজী ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। শ্রমিক নেতা সাপুজী শাকলাতওয়ালাও পার্লামেণ্টে নির্বাচিত হয়েছিলেন শ্রমিক দলের সদস্য হিসেবে। সে সময় ভারতীয় যিনিই ইংলণ্ডে গেছেন ও বসবাস করেছেন, তিনিই বিলেতের শিক্ষাদীক্ষা ও চিন্তার উদারতায় যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছেন এবং শিক্ষিত ইংরেজ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রশংসাবাক্যও উচ্চারণ করেছেন।

ভারতের মাটিতে কিন্তু এই ইংরেজের শাসকমূর্তিই সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিল। প্লেগ কমিশনার র‍্যাণ্ড এর 'সৎপ্রচেষ্টা মূলক' ব্যবহার দ্বারাই তার একটা চিত্র পাওয়া যায়। তা ছাড়া সিপাহীযুদ্ধের পর ভারতে সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন প্রকাশ ঘটে, স্বয়ং মহারাণী শাসনভার হাতে তুলে নেবার পর।

ভারতের ইংরেজী শিক্ষিত স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিদের সামনে জাতীয় আন্দোলনের রূপটি ছিল স্বায়ত্ত শাসনের সীমিত স্বাধীনতা। সমাজের উপরিতলে বিচরণকারী মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সমাজের লোকেরা ছিলেন এই দলে। এরই পাশাপাশি একটা চরমপন্থী মতবাদও ধীরে ধীরে মাথা তুলছিল, তবে তাও সশস্ত্র বিপ্লবের কথা বলে নয়, আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে। সশস্ত্র বিপ্লবের কথা তখন সামগ্রিকভাবে স্পষ্ট করে বলতে সুরু করেন বাংলা ও বেনারসের বিপ্লবীরা এবং সাভারকর স্থাপিত অভিনব ভারত সংঘ, যা পূর্বে 'মিত্র মেলা' বলে পরিচিত হয়। এই বিপ্লবী চেতনার পাশাপাশি যে শ্রমিক ধর্মঘটের জোয়ার আসছিল, বোম্বাইয়ের সুতাকল শ্রমিক এবং কলকাতার গাড়োয়ানদের, তাছাড়া চটকল শ্রমিক ও ছাপাখানা শ্রমিকদের মধ্যে। তবে এই আন্দোলনগুলির সুদূর প্রসারী রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্বন্ধে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের ধারণাও ছিলো সীমাবদ্ধ।

একদিকে এই শ্রমিক ধর্মঘট, অন্যদিকে ছোটোখাটো কৃষক বিদ্রোহও মাথা চাড় দিচ্ছিল। এই কৃষক বিদ্রোহের মধ্যে নীল বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। বিভিন্ন স্থানের এই বিদ্রোহ ও ধর্মঘট নিবারণ করতে শাসক শ্রেণী যে দমন পীড়ন সুরু করে, তার চেহারাটা ভয়ংকর ভাবে দেশবাসীর সামনে ফুটে ওঠে। একটা জমাট বাঁধা ক্রোধ ধীরে ধীরে লোকের মনে বেড়ে উঠতে থাকে, তা পরে ফেটে পড়ে লর্ড কার্জনের প্রস্তাবিত বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে।

ভারতের উচ্চশিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর সামনে এই সামগ্রিক অবস্থাটি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি স্তরে ছিল তা বলা যায় না। কিন্তু ব্রিটেনের ও য়ুরোপের সমাজতন্ত্রী দলগুলির নেতৃবৃন্দ এই অবস্থাটা সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন বলে মনে হয়। এদিকে ভারতে দমননীতি ক্রমে মাত্রা ছাড়াতে থাকে, ১৯০৭ সালের ১০ই মে প্যারিসের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে লালা লাজপত রায় এবং সর্দার অজিত সিংকে নির্বাসিত করা হয়েছে।

ইণ্ডিয়া হাউসে ফ্রি ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপিত হওয়ার পর থেকে সাভারকরই তার নেতৃত্ব দিতে থাকেন। ইতিমধ্যে ১৯০৭ সালে শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা প্যারিসে চলে আসেন এবং কামাও তাঁর সঙ্গেই চলে আসেন। প্যারিসে তাঁদের যৌথ উদ্যোগে একটি বৈপ্লবিক কর্মকেন্দ্র গড়ে ওঠে। লালা লাজপত রায় এবং অজিত সিং এর নির্বাসনের প্রতিবাদে ভারত সংঘ থেকে মাদাম কামা ও সর্দার সিং রাণার উদ্যোগে ১৮ই মে এক সভা আহূত হয়। এই সভায় মাদাম কামা এক অগ্নিঝরী ভাষণ দেন, তাতে তিনি এই পুলিশী অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রকৃত শাসক রূপটির প্রতি দৃষ্টি

আকর্ষণ করেন। ইতিমধ্যে য়ুরোপে সাম্রাজ্যবাদী সংকট ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়ে ওঠছিল। আসন্ন যুদ্ধের সম্ভাবনায় তখন সকলেই উদ্বিগ্ন।

এই সময় ১৯০৭ সালের আগষ্ট মাসে দ্বিতীয় সমাজতন্ত্রী আন্তর্জাতিকের সপ্তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় জার্মানীর স্টুটগার্ট শহরে। সম্মেলনে আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ছিল দুটি মূল প্রশ্ন—উপনিবেশবাদ ও ঘনায়মান বিশ্বযুদ্ধের প্রতি শ্রমিকশ্রেণীর মনোভাব কী হবে? এখানে উপনিবেশবাদের প্রশ্ন সম্বন্ধে প্রস্তাব রচনার জন্য যে কমিশন গঠিত হয়েছিল তার অধিকাংশ সদস্য মত প্রকাশ করেন যে এর আগের কয়েকটি সম্মেলনে যে সব উপনিবেশ প্রস্তাবে বিরোধী প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, তা নাকি বড়ই নেতিবাচক। তাই তারা কমিশনে সমাজতান্ত্রিক উপনিবেশিক নীতি অনুসরণের জন্য এক খসড়া প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ওলন্দাজ প্রতিনিধি Vancol ও জার্মান প্রতিনিধি বার্ষ্টাইনের মত সুবিধাবাদী নেতারা। খসড়া প্রস্তাবটি সম্মেলনের পূর্ণ অধিবেশনে পেশ করা হলে তার তীব্র বিরোধিতা করলেন লেনিন, রোজা লুক্সেমবুর্গ প্রভৃতি মার্ক্সবাদী নেতৃবর্গ।

এই সম্মেলনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা মাদাম কামা কর্তৃক ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন। এই সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য শ্রীমতী ভিক্ষায়জী এবং শ্রীসর্দার সিং রাণজী রাণা নির্বাচিত হয়েছিলেন। এর তিন বছর পূর্বে আমস্টারডাম কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রাচীন কংগ্রেস নায়ক দাদাভাই নৌরজী, প্রতিনিধি হিসেবে। এবারেও পুনরায় ধীরপন্থী কোনো রাজনৈতিক নেতা ভারতের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হয়ে মুক্তিযজ্ঞের ঋত্বিকগণের বহু আকাংক্ষিত অভিনয়ে বিঘ্ন ঘটাতে পারেন, এই আশংকাতেই ঐ দুজনকে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, এবং এঁদের সহকারী হিসেবে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কেও নির্বাচিত করা হয়েছিল। কিন্তু ব্রিটিশ প্রতিনিধি Mr. Ramsay Macdonald এঁদের প্রতিনিধিরূপে গৃহীত হতে বাধা দেন। তবে ফ্রান্সের সমাজতন্ত্রী নায়ক Jean Jaures জার্মান নায়ক Bebel, Karl Lebkuecht; Rosa Luxembourg, এবং Hindman-এর সমবেত সমর্থনে শেষ পর্যন্ত নির্বাচিত হন।

এই সম্মেলনে যাবার প্রস্তুতি প্যারিসে অনেকদিন ধরেই চলছিল। সকলে মিলে পরামর্শ করে স্থির করেন, ভারতের একটি জাতীয় পতাকা পরিকল্পনা করা প্রয়োজন, এবং এই উপলক্ষে বহুদিন ধরে প্যারিসে যে পতাকাটির পরিকল্পনা করা হয়, সেটিই ভারতের প্রথম জাতীয় পতাকা। এই পতাকাটি ছিল ত্রিবর্ণ। লাল, গেরুয়া, ও নীল এই তিনটি রঙের পতাকার উপরাংশে এক আধাফোটা শাদা পদ্ম, মাঝখানে দেবনাগরী অক্ষরে লেখা বন্দে মাতরম্ এবং তলায় একপাশে সূর্য অন্যপাশে অর্ধচন্দ্র ও তারা।

পতাকাটি উত্তোলন করা হয়েছিল একটু অভাবনীয় অবস্থায়। যদিও ঔপনিবেশিক দেশগুলির সমস্যাই ছিল আলোচনার বিষয়বস্তু, তবু ঠিক এই পতাকা উত্তোলনের উপযুক্ত পরিবেশ সম্মেলনে ছিল না। তবে মনে হয়, তখন ভারতীয় বিপ্লবী দলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, যে প্রকারেই হোক, ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্বন্ধে প্রস্তাব উথাপন করা। এই পতাকা উত্তোলন করে শ্রীমতী কামা নিম্নলিখিত প্রস্তাব উথাপন করেন,—"That the continuance of British rule in India is positively disastrous and extremely injurious to the best interest of India and lovers of freedom of all."

বৃটিশ প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় না। মাদার কামার এই কৃতিত্ব খুবই উল্লেখযোগ্য বলে বর্ণিত হয় এবং ব্যক্তিগত ভাবে মাদাম কামা উপস্থিত সকলের প্রশংসা অর্জন করেন। এ প্রবন্ধে উল্লেখযোগ্য, যে কাইজার প্রেসিডেন্ট উইলসনের কাছে লেখা তাঁর বিখ্যাত চিঠিতে বলেন, ভারতের সম্পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা পৃথিবীব্যাপী শান্তি রক্ষার অন্যতম অপরিহার্য শর্ত হওয়া উচিত।

এই ব্যাপারটিতে একটি তথ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তা হল আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী কংগ্রেসে যদিও সমগ্র পৃথিবীর সমাজতন্ত্রীরা সমবেত হয়েছিলেন, তবু ধনতান্ত্রিক এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশের সমাজতন্ত্রীরা ঔপনিবেশিক দেশের সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে তখনও কোন স্পষ্ট ধারণায় পৌছাননি। রজনী পাম দত্তের 'International' নামক সংকলনে উল্লেখ করা হয়েছে কেউ কেউ বলেছেন, যে 'আমরা ঔপনিবেশিক দেশগুলিকে জয় করে তাদের সমাজতন্ত্র শিক্ষা দেবো।' তা ছাড়াও পুরো য়ুরোপ খণ্ডের বৃহৎ শক্তিগুলি তখন আন্তর্জাতিক বাজার বন্টনের মহাদ্বন্দ্বে নিযুক্ত, সে সময় ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে আলাদা করে চিন্তা করার কথা তাদের মনে হয়নি। অন্যাবধি অবশ্য সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রী মহলে এই বিভেদ লক্ষ্য করা যায়। ঔপনিবেশিক দেশের নিজস্ব সমস্যার প্রথম সমাধান যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, তার কথা সাম্রাজ্যবাদী কাইজার বুঝেছেন, কিন্তু সমাজতন্ত্রী নেতৃবর্গ বোঝেননি সেদিন।

১৯০৭ সাল ভারতের ক্ষেত্রে এক অবিস্মরণীয় বৎসর। লোকমান্য তিলকের নেতৃত্বে বামপন্থীরা ক্রমশঃ সম্মুখবর্তী হতে আরম্ভ করেছেন। তিনি কংগ্রেসের নরম পন্থা সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা করতে থাকেন এবং তাঁর এই চিন্তাধারা প্রদেশে প্রদেশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এরই ফলে সুরাটে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ভেঙে যায়। তিলক অনুসারী iron sides এবং অভিনব ভারতের যুবব্রন্দ সমবেতভাবে কংগ্রেসের বিরোধিতা করেন। লালা লাজপৎ রায় এবং অজিত সিংকে ঘোপান্তরিত করার সংবাদে সুদূর য়ুরোপবাসী ভারতীয়রাও চঞ্চল হয়ে ওঠেন এবং তীব্র প্রতিবাদ করেন। ষ্টুটগার্ট কংগ্রেসে ভাষণ দান কালে এই সংবাদে মাদাম কামা বলেন,—

"We are burning with rage at this gross injustice and I wonder how any one in his senses can expect us to take it lying down. I wish I could break open the very prison doors and bring out Lajpat Rai."

স্টুটগার্ট সম্মেলনে যোগদান করার পর ভারতীয় বিপ্লবীদের কর্মপন্থা সাধারণভাবে সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী যুদ্ধবিরোধী ছিল। এই সময় মাদাম কামা সম্বন্ধে সরকারী অভিযোগ, তিনি সৈন্যদলের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করার চেষ্টা করেছেন।

ইতিমধ্যে সাভারকরের গ্রেপ্তার, তাঁর পলায়ন এবং পুনর্বার তাঁর গ্রেপ্তার এক আন্তর্জাতিক কেলেংকারীর সূচনা করে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে। সাভারকরের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, যখন তাঁর ভ্রাতা গণেশ দামোদর সাভারকার নাসিক জ্যাক্সন হত্যা মামলায় অভিযুক্ত হন। গণেশ সাভারকরের কাগজপত্র পরীক্ষা করে তাঁরা জানতে পারেন এ ব্যাপারে বিনায়ক সাভারকরের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে। ইণ্ডিয়া হাউসের পাচক ছত্রভূজ আমীনের জিনিসপত্রের মধ্যে যেসব পিস্তল ভারতে পাঠানো হয়েছিলো, তার হদিস সরকারী মহল পায় এবং অনুসন্ধান করে য়ুরোপে

বসবাসকারী ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে এর যোগসূত্র আবিষ্কার করে। এই মামলায় মাদাম কামা গণেশ সাভারকরকে সমর্থন করার জন্য ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করেন ও পিস্তল প্রেরণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। কিন্তু তখন তাঁর নামে ওয়ারেন্ট বার হয় নি।

বিনায়ক সাভারকর এ সময় প্যারিসে ছিলেন, এবং সর্দার সিং রাণা, মাদাম কামা ও আরও অনেকে তাঁকে ঐ সময় ইংলণ্ডে যেতে বাধা দান করেন। মাদাম কামা সাভারকরকে বলেন যে এ সময় একজন বিপ্লবীকেও আত্মসমর্পণের পথে যেতে দেওয়া উচিত নয়। সাভারকর ইংলণ্ডে গেলে নিশ্চয় ধরা পড়বেন এবং তাঁর ফাঁসী পর্যন্ত হতে পারে। ঠিক এই সময় সাভারকরের মত কর্মীকে এভাবে আত্মসমর্পণ করতে দেওয়া উচিত নয়। সাভারকর এ সমস্ত যুক্তিকেই উপেক্ষা করেন, কারণ তিনি ইংলণ্ডের সংগঠন সম্বন্ধে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। মদন লাল ধিংড়ার ফাঁসীর পর ইংলণ্ডে বসবাসকারী ভারতীয়দের উপর সরকারী শাসনের তীব্রতা আরো বেড়ে গেল। সহকর্মিগণের মনোবল যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে এবং সংগঠন যাতে ভেঙে না যায়, তার জন্যই সাভারকর স্থির করলেন লণ্ডনে ফিরবেন। ১৯১০ সালের ১৩ই মার্চ তিনি ভিক্টোরিয়া স্টেশনে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার সঙ্গে ছিলেন শ্রীমতী পেরিনবেন ক্যাপটেন, দাদাভাই নওরোজীর দৌহিত্রী কিন্তু শ্রীমতী পেরিনবেনকে গ্রেপ্তার করা হয় না।

সাভারকরকে ব্রিটিশ সরকার তখন ভারতে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। যে জাহাজে তিনি বন্দী অবস্থায় ছিলেন, সেই জাহাজ যখন মার্সাই (Marsailles) বন্দরে পৌছায় তখন স্নানাগারের জানলা দিয়ে সাভারকর সমুদ্রে লাফিয়ে পড়েন, এবং সাঁতার কেটে তীরে পৌছান। এরকম একটা সম্ভাবনা যে ছিল তা মাদাম কামা ও তাঁর সহযোগিগণ জানতেন। তাঁরা এজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাও করেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁদের ঘটনাস্থলে পৌছাতে দেরী হয়ে গিয়েছিল। সাভারকর ফরাসী ভাষা জানতেন না বলে পলায়নের সময় একজন বন্দরের পুলিশের কাছে নিকটবর্তী থানার সন্ধান চান। ইতিমধ্যে জাহাজ থেকে চোর! চোর! আওয়াজ শুনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় পুলিশটি তাকে আবার জাহাজের মালিকের কাছে প্রত্যর্পণ করে। ইতিমধ্যে মাদাম কামা ফরাসী সমাজতন্ত্রী নেতা এবং তদানীন্তন মেয়র জাঁ জ্যোরেসের (Jean Janris) সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং তাঁকে চেষ্টা করতে অনুরোধ করেন, যাতে ফরাসী ভূমিতে ধৃত সাভারকরকে ফরাসী সরকারের হাতে দেওয়া হয়। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এ অনুরোধে কর্ণপাত করেন না, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক সংবাদপত্র জগতে এক বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল, একেই l' affari Savarkar বলে বিশ্বখ্যাত কেলেংকারী বলে আখ্যা দেওয়া হয়। ফরাসী সংবাদপত্র l' Eclaire le temps : le matin. ইত্যাদি পত্রপত্রিকা ফরাসী ভূমিতে সাভারকরের গ্রেপ্তারের তীব্র প্রতিবাদ করেন। ইংলণ্ডেও 'Herald of Revolt' পত্রিকার তরুণ সম্পাদক Gry. A- Aldred তুমুল আন্দোলন উত্থাপিত করেন। ইংলণ্ডে সাভারকর মুক্তি সমিতি স্থাপিত হয়। এ বিষয়ে বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক দপ্তর, যথা, স্পেনের সহকারী রাষ্ট্রদূত M. Perron, পারাগুয়ের সহকারী রাষ্ট্রদূত M. Jembon এবং কলিকাতাবাসী পর্তুগালের রাষ্ট্রদূত, সকলেই মত প্রকাশ করেন যে, সাভারকরের ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তনের যে দাবী ফরাসী সরকার উপস্থাপিত করেছেন, তা ন্যায়সঙ্গত। আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে পলাতক

রাজনৈতিক অপরাধীকে প্রত্যার্পণ করা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিচারাধীন থাকবে না আন্তর্জাতিক বিচারাধীন থাকবে, এই মর্মে ফরাসী সংবাদপত্র জগতে বহু আলোচনা হয়েছিল।

মাদাম কামার ভূমিকা এই ক্ষেত্রে যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। ১৯১১ সাল থেকে মাদাম কামা তলোয়ার ও Indian Freedom নামে পত্রিকা দুটি চালাতে থাকেন। এর পূর্বেই প্যারিসের বিপ্লবী সংগঠনের দায়িত্ব মাদাম কামার উপরে বর্তেছিল। সাভারকরের ভারতে উপস্থিতি, বিচার এবং দ্বীপান্তরের ফলে য়ুরোপের সংগঠনের দায়িত্ব প্রধানতঃ মাদাম কামার উপরেই পড়ে।

ইতিমধ্যে য়ুরোপে প্রথম মহাযুদ্ধের দুর্যোগ দ্রুত ঘনিয়ে আসতে থাকে। বহুদিন থেকেই এই প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা পশ্চিমী শক্তিবর্গের চোখে ধরা দিয়েছিলো, এবং এই যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবিতা সম্বন্ধে সকলে প্রায় সুনিশ্চিত ছিলেন। এই মহাযুদ্ধের পরিণতি এবং তার ফল যে সুদূরপ্রসারী হবে এ সম্বন্ধে শাসক বুর্জোয়া শ্রেণী এবং সমাজতন্ত্রী বিপ্লববাদী কারোরই দ্বিমত ছিলো না। সমাজতন্ত্রী সম্মেলনে যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবিতা সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং নীতি হিসেবে তারা যুদ্ধবিরোধিতা করবেন বলে স্থির করেন। এই সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি ছাড়া যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ইংলণ্ড থেকে Ramsay Maedonald, De leon এবং Big Bill Haywood. আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে, Plekhanov, Lenin, Trotsky এবং Alexandua kolontay. রাশিয়ার সমাজতন্ত্রী দলের বিভিন্ন গ্রুপ থেকে, রোজা লুক্সেমবুর্গ এবং ক্লারা জেটকিন, কুমারীদ্বয় এবং ইটালীর Angoliea Balabanov এর সঙ্গে আগত একটি তীব্র ভাষায় বক্তব্য প্রকাশকারী যুবক, গাঢ় তাম্রবর্ণ মুখ, নাম বেনিটো মুসোলিনী।

সম্মেলনে Jean Jauris এক প্রস্তাবে ঘোষণা করেন যে, কর্মীদের এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দরকার হলে সর্বাত্মক হরতাল এমনকি বিপ্লবী অভ্যুত্থান সম্মেলন করতে হবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে। আবার সঙ্গে সঙ্গে এ দায়িত্বও নিতে হবে, যদি দেশ আক্রান্ত হয়, তবে দেশকে রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। যদিও এই বক্তব্য কর্মীদের মনে একটু বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল, তবু এর মূল উদ্দেশ্যটিকে স্থির রেখে লেনিন এবং রোজা লুক্সেমবুর্গ নতুন দুটি সংযোজনী প্রস্তাব দিয়ে এই প্রস্তাবটিকে সম্মেলনে পেশ করেন এবং প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। অবশ্য প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতীয় বিপ্লবীদের কি কর্তব্য হবে, তা নিয়ে নানারকম মতপার্থক্য হয়েছিলো। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের যুদ্ধ বাধলে ভারতের সুবিধা হতে পারে এই ভেবে কোনো কোনো বিপ্লবী আশান্বিত হয়েছিলেন, কিন্তু সে আশা সফল হয়নি। বরং ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ জার্মানীর সঙ্গে মিত্রশক্তির যুদ্ধ ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বিপ্লবীরা তাঁদের কর্তব্য স্থির করেন। তাঁরা নিশ্চিন্ত হন যে এ যুদ্ধে ব্রিটিশ নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ থেকে সিপাহী আমদানী করবে। ইতিমধ্যে যদি ভারতীয় সৈন্য জার্মানীর পক্ষে যোগদান করে, তবে ব্রিটিশ শক্তি উপলব্ধি করবে, ভারতে তাদের কতখানি প্রভাব। এই ব্যাপারে আমেরিকাস্থিত কয়েক জন ভারতীয় বিপ্লবী জার্মান গভর্ণমেণ্টের যুক্তরাষ্ট্রস্থিত প্রতিনিধির কাছে প্রস্তাব করেন যে, তারা একটি ভারতীয় স্বেচ্ছাসৈনিক পল্টন জার্মানীর প্রতি সহানুভূতি ও ইংরেজ বিদ্বেষের প্রদর্শনের জন্য পাঠাতে চান। বিপ্লবীরা সৈন্য, ডাক্তার ও এম্বুলেন্সের লোক নিজেরাই দেবেন, বাকী সব ভার জার্মাণ

গভর্ণমেণ্টের। এই প্রস্তাব জার্মান গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি সানন্দে গ্রহণ করেন এবং বার্লিনে এই সংবাদ পাঠিয়ে দেন। অবশ্য বিপ্লবীরা সকলে এই প্রস্তাব সমর্থন না করায় এ প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হয়। পরে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'জাপান এশিয়ার শত্রু' নামক পুস্তিকা প্রকাশের পর জার্মাণ গভর্ণমেণ্ট নতুন করে এদিকে মনোযোগ দেন এবং জার্মানীর রাষ্ট্র শীর্ষগত সিদ্ধান্ত হয় ভারতের বিপ্লবীদের স্বাধীনতা সমরে সাহায্য করা। এর পরেই বিপ্লবীরা কয়েকটি সতে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন,

( ) বিপ্লবীরা জার্মাণ গভর্ণমেণ্টের নিকট একটা জাতীয় ঋণ গ্রহণ করবেন। তারা এই দলিলে সই করেন যে কৃতকার্য হলে স্বাধীন ভারতের গভর্ণমেণ্ট এই ঋণ পরিশোধ করবে।

(২) জার্মানেরা অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করে এবং তাদের দেশবিদেশে যত প্রতিনিধি আছে (consuls) সকলে বৈপ্লবিক কর্মে সহায়তা করবে।

(৩) তুর্কি গভর্ণমেণ্ট তখনও নিরপেক্ষ থাকলেও জার্মাণের পক্ষ হয়ে মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে 'জেহাদ' ঘোষণা করবেন। এই ধর্মযুদ্ধ ঘোষণার ফলে ভারতে বিপ্লব চেষ্টার সুবিধা হবে। এই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বার্লিনে ভারতের বৈপ্লবিক কমিটি (Indian Independence Committee) স্থাপিত হয়। এই কমিটিতে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র দেন, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র রায়, ডাঃ অবিনাশ ভট্টাচার্য ও বীরেন্দ্রনাথ সরকার (অধ্যাপক বিনয় সরকারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) ছিলেন।

এই বার্লিন কমিটি স্থাপনের পর তাঁদের সর্বপ্রধান কাজ হল দেশ ও বিদেশস্থিত বিপ্লবীদের সংবাদ দান করা এবং কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার জন্য আহ্বান করা। কমিটি স্থাপনের গোড়া থেকেই ভারতীয় সমস্ত বৈপ্লবিক দলগুলিকে একত্র করে কাজ করতে চেষ্টা করা হয়। বাইরে আমেরিকার 'গদর পার্টি' বার্লিন কমিটির সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করতে আরম্ভ করায় কমিটির বিশেষ লোকবল লাভ হয়।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক সন্ধির স্থান নির্বাচিত হয় প্যারিসে। এই সন্ধি প্রস্তাবের সময় ভারতীয় আত্মশাসনের দাবীর কথা উল্লেখ করা হবে বলে বার্লিন কমিটি স্থির করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়নি।

এই যুদ্ধের সময় মাদাম কামার ব্যক্তিগত কার্যকলাপ পুরো জানা যায় না, তবে এটুকু মনে করা যায় যে বার্লিন কমিটির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তাঁকে বন্দী করা হয়, তিনি ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ প্রচার করছেন, এই অভিযোগে। এ প্রসঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস' থেকে জানা যায় যে, ভারতীয় সিপাহীদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মার্সাই বন্দরে। সেখানে তাদের যে ভাবে রাখা হয়েছিল এবং যে ভাবে তাদের সাথে ব্যবহার করা হয়েছিলো, তাতে তাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তীব্র শীতে এবং বর্ণ বৈষম্যের তীব্র প্রকাশে তাদের অনেকেরই পরিত্রাহি অবস্থা ঘটেছিল। এই সময়ে কমিটি তাদের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। এই প্রচারের অপরাধে (?) প্যারিসস্থিত ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে সর্দার সিং রাণা সপরিবারে মাতৃনিক দ্বীপে নির্বাসিত হন, মাদাম কামাও নির্বাসিত হন, কিন্তু ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য এবং ব্যারিষ্টার Longuet-এর অনুরোধে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট তাঁকে Vichy-তে এবং পরে Bordeaux-তে অন্তরীণ করে রাখেন। যুদ্ধ শেষ না হওয়া

পর্যন্ত মাদাম কামা Vichy-তেই ছিলেন। তখন তাঁর স্বাস্থ্যও ভাল ছিল।

যুদ্ধের সূচনায় প্রথমেই ফরাসী সমাজতন্ত্রী নেতা Jauris প্রাণপণে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার সুরু করেন। কিন্তু তদানীন্তন পরিস্থিতিতে জাতীয়তাবাদের নামে যুদ্ধ-প্রয়োচনা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে, সমগ্র য়ুরোপেই সমাজতন্ত্র-বিরোধীরা জাতীয়তাবাদের আড়ালে ক্রমশঃ দানা বাঁধতে থাকে। আসন্ন যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্বন্ধে জোরেস দিনের পর দিন বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দিতে থাকেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে একেবারেই সরিয়ে দেওয়া সম্বন্ধে সমাজতন্ত্রের বিরোধীরা দৃঢ় সংকল্প হন। ১৯১৪ সালের ৩ শে জুলাই জনৈক 'জাতীয়তাবাদী' যুবকের গুলিতে জোরেসের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার ফলশ্রুতি স্বভাবতঃ সোস্যাল-ডেমোক্রাট শক্তির মতভেদের ক্ষেত্রটি প্রশস্ততর করে এবং কার্ল লিবনেষ্ট, রোজা লুক্সেমবুর্গ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের তীব্র বিরোধিতা সত্বেও যোগদানের জন্য সকলে সম্মত হন।

যুদ্ধের পর সমগ্র পৃথিবী জোড়া বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যাবার পর অন্য অনেকের মতই মাদাম কামাও হতাশ হয়ে পড়েন। তবে জার্মানীর পুনর্গঠনের দিকে অনেকের মত তিনিও আশান্বিত হৃদয়ে লক্ষ্য করতে থাকেন। তখন জাতীয়তাবাদের দারুণতম পরিণতি ফ্যাসিবাদ এর ভয়ংকর রূপ সকলেরই অচিন্তনীয় ছিল। যাই হোক, বন্দীদশা থেকে মাদাম ছাড়া পান সম্ভবতঃ ১৯১৯ সালে M. Lipine নামক একজন কর্তৃস্থানীয় পুলিশ কর্মচারীর সহায়তায়।

এই সময়ে লেনিন তাঁকে পুনঃ পুনঃ রাশিয়া যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু তিনি সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি। প্রখ্যাত রুশ লেখক ম্যাক্সিম গোর্কীর সঙ্গে তাঁর প্রচুর পত্রালাপ হয়েছিল। তার দুটি পত্র জাতীয় মহাফেজখানায় সংরক্ষিত আছে, পত্র দুটির মর্মার্থ নিম্নরূপ,—

প্রিয় মহাশয়া,

আমার অনুরোধের জবাবে আপনার সদয় প্রত্যুত্তরের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই সূত্রে আরো একটি প্রস্তাব করার সুযোগ নিচ্ছি।

রাশিয়ান পত্র পত্রিকার জন্য আপনি কি একটি প্রবন্ধ লিখতে পারবেন? বিষয়টি হবে, 'ভারতীয় নারী-সমাজ, তাদের বর্তমান অবস্থা এবং ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে তাদের কৃতিত্ব'?

'রুশ গণতন্ত্র' এবং 'রুশীয় নারী-সমাজ' আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে যদি তারা গঙ্গাতীরের দেশের লোকের, গণসংগ্রামীদের ও মেয়েদের জীবন ও সংগ্রাম সম্বন্ধে কিছু জানতে পারে।

আমার সম্মান জানাচ্ছি এবং সাদর করমর্দন করছি। ম্যাকসিম গোর্কী

এর উত্তরে মাদাম কামা গোর্কীকে লিখেছেন,—

প্রিয় মহাশয়,

আপনার প্রেরিত ২৯ ডলার পেয়ে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আপনার চিঠিও পেয়েছি। 'রুশ গণতন্ত্র' ও 'রুশীয় নারী সমাজ' সম্বন্ধে লিখতে বলেছেন। (এটি ভুল ধারণা, কারণ ঐ দুটি নাম দুটি পত্রিকার বিষয়বস্তু নয়), আমার সারা জীবন কেটে গেছে আমার মাতৃভূমির জন্য সংগ্রাম করে। যাই হোক, যদি আমার দেশ সম্বন্ধে আমি কিছু লিখতে পারি, তবে নিশ্চয়ই আপনার অনুরোধ রাখবো। 'আমি এই সঙ্গে সাভারকরের বইটি পাঠালাম।

ভগিনীর শুভেচ্ছা সহ : বি. আর. কামা

১৯২৫ সালে শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে মাদাম কামার দেখা হয়। মাদাম কামা তাঁকে বলেন, "Keep your flag high like Admiral Togo and organise the ouvriers (workers) and paysans (peasants) of India."

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে জওহরলাল নেহরু য়ুরোপ যান। তাঁর আত্মজীবনীতে মাদাম কামার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের কথা লেখেন। "We saw Madame Cama rather fierce and terrifying as she came upto you and pured into your face and pointing at you asked abruptly who you were. The answer made no difference (probably she was too deaf to hear it) for she formed her own impressions and sttuck to them despite facts to the contrary.

এই বর্ণনাটি পড়ে মাদাম কামা সম্বন্ধে যে একটু ভিন্ন ধারণা হয়, তা বলাই বাহুল্য। অবশ্য জওহরলাল তখন বয়সে নবীন, তাঁর অভিজ্ঞতাও ছিল সীমিত, তাছাড়া প্রথম মহাযুদ্ধের সমসাময়িক কালে নানা দেশ থেকে গুপ্তচরের আগমনও ছিল স্বাভাবিক। তাই মাদামের অযথা সন্দিগ্ধ স্বভাবের বিষয়ে জওহরলালের মন্তব্য সুশ্রাব্য না হলেও সম্ভবপর। তবে তাঁর স্বাস্থ্য তখনও অত ভেঙ্গে পড়েনি।

১৯৩১ সালে হিটলারের ক্ষমতাসীন হবার পর মাদাম কামা আশান্বিত হয়ে ওঠেন। হয়তো তিনি ব্রিটেনের দর্পচূর্ণ হওয়ার কথাও কল্পনা করেন। অন্য অনেকের মতো নাৎসিবাদের ভয়াবহ পরিণতি সম্বন্ধে তিনিও সচেতন ছিলেন না।

তখন তাঁর স্বাস্থ্য একেবারেই ভেঙে গেছে। ইতিপূর্বেই প্যারিসের একটি সমাধিক্ষেত্রে তাঁর নিজের উদ্দেশ্যে কেনা একটি সমাধি স্থান তিনি অন্য একজন দেশবাসীকে দান করেন। শেষ কয়েকটা দিন ভারতে কাটাবার জন্য তিনি অনুমতি চেয়ে পত্র লেখেন, এবং বহু কষ্টে অনুমতি পান। ১৯৩৫ সালে তিনি বোম্বাই-এ এসে দাদাভাই নওরোজীর দৌহিত্রী পেড়িন বেন ক্যাপটেন এর গৃহে আশ্রয় নেন। আট মাস পরে পার্শী জেনারেল হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালেও তার স্বামী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি।

মাদাম কামার বিচিত্র জীবনের সমগ্র পরিচয়টী এখনো উদ্ধার করা হয়নি। বিদেশে নানা নথিপত্রে এখনও তাঁর নানা লেখা রয়েছে, যা আজও অনাবিষ্কৃত। কেবল ইউরোপ নয় আমেরিকায়ও তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল বিস্তৃত। এই বিদ্যুৎপ্রভা মনস্বিনী নারীর একটি সামগ্রিক জীবনচিত্র অংকন অবশ্য প্রয়োজনীয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অনাবিষ্কৃত ইতিহাসও তার সঙ্গে জড়িত। ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে হয়তো একটু তৎপর হবেন, এইটুকুই আশা।

চর্য্যাগানে রমণী সমাজ

রাধিকারঞ্জন চক্রবর্ত্তী

বৌদ্ধ সহজীয়া সম্প্রদায়ের চর্য্যাগানে রমণী সমাজের চিত্রটি কাব্যস্নিগ্ধ ভাষায় রসরূপ লাভ করেছে। কিন্তু সেই সমাজ, হীন অন্ত্যজের সমাজ। আবার কয়েকটি চর্য্যাগানে 'প্রকৃত' রমণী সমাজের জীবন-চিত্র স্বল্প রেখায় নিখুৎ ভাবে রূপায়িত হয়েছে। দু'য়েরই সামাজিক জীবনযাত্রা কিছুটা শিথিল। সেখানে লোকলজ্জা, ঘৃণা বা সংকোচ বলতে কিছু নেই। নৃত্য-গীত এখানকার রমণীদের অন্যতম বিলাস। এই সহজ সুন্দর, নৃত্যগীতময় জীবনযাত্রা বর্ণশ্রেষ্ঠীদের মনে এক বিচিত্র ভাবাবেগ সৃষ্টি করে। আলোচ্য সমাজের রমণীরা আচারবদ্ধ জীবনের গতি থেকে মুক্ত। মুক্ত বিহঙ্গীর মতই এরা স্ববশ ও স্বচ্ছন্দ। লোকাচার বা সংস্কারের কোনরকম প্রভাব এদের মনে নেই। তাই এরা পরিশুদ্ধ চিত্ত। আবার পরিশুদ্ধ চিত্ত স্বভাবতই অচঞ্চল এবং মনোধর্মের অতীত। এমন একটি চিত্ত নৈরাত্মার স্পর্শে সঞ্জীবিত। এর মধ্যে মহাসুখের তরঙ্গ অনুভূত। নৈরাত্ম ধর্মের সহজীয়া যোগীরাও আত্মপর ভেদবুদ্ধি ও সংস্কারশূন্য। লোকলজ্জা, ঘৃণা, সংকোচ বলতে তাদের কিছু নেই। অতএব সেই পরিশুদ্ধ চিত্তা এবং নৈরাত্মার প্রতীক স্বরূপা অস্পৃশ্যা বা নীচ জাতীয় রমণীর সঙ্গলাভে তাদের বাধা নেই। বলাবাহুল্য ধর্মাচারণে জাতিভেদ ও সংস্কার সহজযানীযোগীরা মানতেন না। ডোম্বী, রজকী, নটী, চণ্ডালী ইত্যাদি অন্ত্যজ শ্রেণীর রমণীদের তাঁরা সঙ্গ করতেন এবং সাধন সঙ্গিনীরূপে কামনা করতেন: আলো ডোম্বী তো এ সম করিবে ম সাঙ্গ [ওগো, ডোমনী, আমি তোকে সাঙ্গা করব (চর্য্যা ॥ ১ ॥)। ধর্মাচরণের ব্যাপারে এই বিষয়টি প্রাচীন কালেও বলবৎ ছিল। রামায়ণীয় সমাজে শবরীকে বলা হয়েছে, সিদ্ধা। নীচ জাতীয়া হলেও শবরী শ্রীরামচন্দ্রের অনুগ্রহ লাভ করেছিল। [রামায়ণ/সপ্তম কাণ্ড/ ৩. ৭৪, ৬-১০]

সে যুগে ডোম রমণীরা লোকবসতির বাইরে বসবাস করত: তাদের-কোন প্রতিবেশী ছিলনা। শবর-শবরীদের বাস ছিল, উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় [চর্য্যা ।। ১০ ॥ ও ॥ ২৮ ।।] এই সমাজ ব্যবস্থা সুপ্রাচীন। কৌটিল্যের সমাজেও (৪র্থ শতক) একই ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ আছে, চণ্ডালেরা সমাজের বাইরে বাস করত। শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি উপজাতি বনে বাস করত। [কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র/ ১. ১০., ১. ১২., ১৭]। চণ্ডাল (চাঁড়াল) ডোম জাতির মত অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত; কিন্তু উভয়ের জীবিকাবৃত্তি ভিন্ন। কৌটিল্যের সমাজে একমাত্র চণ্ডাল ছাড়া অন্যেরা শূদ্রের বৃত্তি অবলম্বন করতে পারত। চর্য্যাপদের সমাজে চণ্ডাল চণ্ডালীদের জীবিকা বৃত্তির উল্লেখ না থাকলেও ডোম-ডোমিনীদের জাতিবৃত্তির কিছু কিছু পরিচয় আছে; কিন্তু সেই বৃত্তি পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তারা জীবিকার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বৃত্তি গ্রহণ করত। সেগুলি অধিকাংশই ছিল শূদ্রের।

রমণী সমাজে অলঙ্কারের মধ্যে ছিল, কঙ্কন, বাজনুপুর, মুক্তাহার ও কুণ্ডল। কানেট) [কানেট চৌরিনিল অধরাতী ॥ চর্য্যা ২ ॥ (অর্ধরাতে চোর কানের কুণ্ডল নিয়ে গেল) / [আলিকালি ঘণ্টা

নেউর চরণে/রবিশশী কুণ্ডল কিট আভরণে ।। চর্যা ১১ ।। (লোকাভাসকে তিনি পায়ের বাজনূপুর করেছেন এবং দিনরাত্রি জ্ঞানকে করেছেন কানের কুণ্ডল)] / [হায়রে কাঙ্কাল মা লোউ দাপন ।। চর্যা ২২ ।। (হাতের কঙ্কন দেখার জন্য আয়না ব্যবহার করোনা) / [পরম মোখ লব এ মুক্তিহার ।। ১১ ।।/ (পরম মোক্ষের মুক্তিহার লাভ করেছে)]।

রমণীরা প্রসাধন কাজে আয়না ব্যবহার করত [চর্যা ।। ৩২ ।। / ৪৬ ।।]। প্রসাধন সামগ্রীর মধ্যে ছিল। সিঁদুর এবং আলতা। বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরা তখনো সীমন্তে সিঁদুর ধারণ করত। গোবর্ধন আচার্যের ভাষায়, সিন্দুরীতসী মস্তছলেন হৃদয়ং বিদীর্ণমেব [সীথির সিঁদুরের ছলে বিদীর্ণ হৃদয় হয়েছে (আর্য্যা সপ্তশতী)]। উভয় উচ্চ ও নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোকেরা এক বস্ত্র ধারণ করত এবং মাথায় ঘোমটা দিত। তাদের দৃষ্টি স্বভাবতই লজ্জাবনত এবং পায়ের নীচে নিবদ্ধ। রমণীদের চালচলন মৃদু মধুর। তারা আচার ব্যবহারে স্বল্পভাষী। লক্ষীধরের বর্ণনায় :

শিরো যদব গুণ্ঠিতং সহজ রূঢ় লজ্জা নতং
গতং চ পরিমন্থরং চরণকোটি লগ্নে দৃশৌ।
বচঃ পরিমিতং চ যন্মধুর মন্দ মন্দা ক্ষরং,
নিজং তদিয় মঙ্গলা বদতি নূনমুচ্চৈঃ কুলম্ ।।

[ঘোমটা ঘেরা মাথা স্বতই লজ্জাবনত চলন ধীর, চোখ পায়ের দিকে নিবদ্ধ; বাক্য স্বল্প এবং মৃদুমধুর—এই দিয়ে যেন এই মহিলা উচ্চস্বরে নিজের কুলমর্য্যাদা প্রকাশ করছেন (ডঃ সুকুমার সেন কৃত প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত)। বৈদিক রমণী সমাজেও অলঙ্কারের প্রচলন ছিল। তার মধ্যে সুবর্ণময় হার, বক্ষস্থলের স্বর্ণালঙ্কার, খাদি (বলয়) এবং কর্ণাভরণ [ঋকঃ ৭।৪৬।১৯, ৭।৫৭।২, ৮।২০।২১]

চর্যাগানে বর্ণিত আদিবাসী রমণীদের বেশভূষার মধ্যে ছিল, পরণে ময়ূর গুচ্ছ, গলায় গুঞ্জনীর (গুঞ্জনা ফুল) এবং গলে কুণ্ডল স্বরূপ ফুলের আভরণ। তাদের পারিবারিক জীবন আসক্তিপূর্ণ। পুরুষেরা রমণীর প্রেমে মত্ত। গার্হস্থ্য জীবনে আদিবাসী রমণীদের রুচিবোধ একটি লক্ষণীয় বিষয়। তাদের জীবন যাত্রা উজ্জ্বল হলেও, মধুর এবং পরিচ্ছন্নময়। তাদের গৃহস্থালীর আশেপাশে জনমানব নেই। চারদিক পাহাড়ে ঘেরা এক বিস্তৃত প্রান্তর। চারপাশ শুধু গাছপালা,যেন প্রকৃতির এক অপরূপ লীলা নিকেতন। এমন এক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে শবরী তার পাগল শবরকে নিয়ে ঘর বাঁধে। তার অপর নাম সহজ-সুন্দরী। শবরীদের প্রেম জীবন আনন্দ বেদনার স্রোতে অবগাহিত। শবরেরা স্বভাবতই স্রৈন। তাদের দাম্পত্য জীবনে প্রেয়সীর ভূমিকা এক মোহান্ধতার স্বরূপ। হাড়িয়া পানে মাতাল শবর-শবরী দিবারাত্র তুরীয়ানন্দে নিমগ্ন। এই মদমত্ততা হেতু তারা অকালমৃত্যু বরণ করে। তবু তাদের দাম্পত্য জীবন প্রেমরসে সমুজ্জ্বল। চর্যাকার শবরপাদ, শবর শবরীদের এই প্রেমচেতনার স্বরূপটি তুলে ধরেছেন তার দুটি চর্যাগানে [চর্যা ।। ১৮ ।। / ।। ৫০ ।।]।

উপজাতি অন্ত্যজ রমণী সমাজেও প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। প্রসাধন চর্চায় দর্পনের ব্যবহার প্রচলিত ছিল : [পেখই সু অণে অদস জইসা যেমন স্বপ্ন দেখা যায়, আরশিতে তেমনি লোক মুখ দেখে) ।। চর্যা ।। ৪৬ ।।] বিলাস চর্চার মধ্যে কর্পূর সহযোগে পান খাওয়া এবং তিন

ধাতুতে তৈরী খাটে মহাসুখে নিদ্রা যাওয়ার বর্ণনা চর্যাগানে স্থান পেয়েছে [চর্যা ।। ২৮ ।।]

বস্তুত ডোম, চণ্ডাল, শবর ইত্যাদি রমণীরা ছিল রূপরম্যা। দেহগত বিলাস এবং রূপচর্চা তাদের ব্যক্তিত্বের প্রধান অঙ্গ ছিল। যৌবন কটাক্ষে তারা চঞ্চল, প্রবৃত্তির লীলায় কিছুটা উদ্ধত ও বেপরোয়া। তাদের রূপ যৌবন সমৃদ্ধ দেহমদিরার লোভে উচ্চবর্ণের লোকেরা স্বভাবতই আকৃষ্ট হোত কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে ভোগলিপ্সু বা সোচ্চার হতে পারত না সামাজিক অনুশাসন ছিল তাদের ক্ষেত্রে একটি প্রধান অন্তরায়। তাই অতি গোপনে সকলের অজ্ঞাতে প্রাণোজ্জ্বল যৌবনের আবেগমণ্ডিত মদালসাদের সান্নিধ্য কামনা করত। ঐ রমণীরা কেবল মদনলালসক অভিসারিকাই ছিলনা, রতি রঙ্গের চৌষট্টি নায়িকার এক একজন কুশলী কলাবতী। রসজ্ঞের মজলিসে ছিল তাদের সতত সঞ্চরণ। কবির ভাষায় তারা শোভনিকা, তড়িল্লেখা ও নিপুনিকা। নীতিবাগীষদের বর্ণনায়, স্বৈরিণী, দ্বিচারিণী এবং বারাঙ্গনা।

নিম্নকোটির রমণীসমাজে বিবাহ ব্যাপারটি ছিল নানা বিধিনিষেধে পরিপূর্ণ। উচ্চ বর্ণজাত ব্রাহ্মণ নিম্নবর্ণের যে কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করতে পারত, কিন্তু নিম্নবর্ণের কোন পুরুষ উচ্চ বর্ণের কোন রমণীকে সহধর্মিনী রূপে গ্রহণ করতে পারত না। আবার নিম্নবর্ণের কোন রমণী উচ্চ বর্ণের কোন পুরুষের সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হলেও সে সহধর্মিনী হিসাবে সামাজিক মর্য্যাদা পেত না। চর্যাপদের সমকালীন যুগে ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজে এই বিধি নিষেধ উদ্ধত প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে ছিল। নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোকের সাথে ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণ প্রসূত যে কোন পুরুষের বিবাহবিধি কোন একটি বিশেষ যুগেই সীমাবদ্ধ ছিল না। অতি প্রাচীন কাল হতে এই নিয়ম চলে আসছে। সংহিতাকার মনুর মতে। দুষ্কুলজাত হলেও স্ত্রীরত্ন বিবাহযোগ্য [মনুস্মৃতি / ২. ২৩৮]। তাছাড়া সেযুগে যৌতুকের লোভে উচ্চবর্ণের পুরুষেরা প্রায়শ অন্ত্যজ বা অধম সংকর সম্প্রদায়ভুক্ত রমণীদের বিবাহ করত। অসবর্ণ বিবাহে যৌতুকের পরিমাণ ছিল বেশী। চর্যাকার কাহ্নপাদের একটি চর্যাগানে এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ উল্লেখ পাওয়া যায় :

অস অস দুন্দুহি সাদ উছলিয়াঁ।
কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে চলি আ ।।
ডোম্বী বিবাহিআ আহারিউ জাম।
জ্যতুকে কিঅ আনতু ধাম ।। [চর্যা ।। ১৯ ।।]

[জয় জয় ধ্বনি উছলিয়া উঠল। কাহ্ন ডোমিনীকে বিয়ে করতে চলল। ডোমনীর বিয়ে হয়ে গেল। তার জন্ম সার্থক হল। শ্রেষ্ঠ যৌতুক পাওয়া গেল।]

তবে নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোককে সাধারণত কেউ বিবাহ করতে চাইত না ; কারণ তারা অধিকাংশই ছিল অন্ত্যজ সম্প্রদায় ভুক্ত। এই দেশের মেয়ে বিবাহ করলে যদিও কোন অপরাধ হত না, কিন্তু তাতে পাত্রপক্ষের সামাজিক মর্য্যাদা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেত। ভুসুকু পাদের একটি চর্যাগানে তার নিদর্শন পাওয়া যায় :

আজি ভুসুকু বাঙ্গালী ভইলী।
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালে লেলী ।। [চর্যা ।। ৪৯ ।।]

এখনকার মত সে যুগেও বিবাহযাত্রা খুব ধুমধামের সঙ্গে হত। বরযাত্রায় ঢাক ও ঢোল জাতীয় বাজনার প্রচলন ছিল। কাহ্নপাদের চর্য্যাগানে তার নিদর্শন পাওয়া যায়। বাসর ঘরের চিত্রটিও ছিল এখনকার মত। মেয়েদের ভিড়ে নববধূ মহাসুখে রাত্রি কাটায় [চর্য্যা ॥ ২৮ ।]। এরপর জীবনের আর এক অধ্যায় সুখ দুঃখ, আলো আধারীতে ঘেরা গার্হস্থ্য জীবন। সেখানে গৃহবধূ একক নয়। পরিবারের সকলকে নিয়ে তাকে ঘর করতে হয়। শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ ইত্যাদি সকলেই থাকে। এমনকি ভগ্নীপতির গৃহে স্ত্রীর ভগ্নীও সমাদরে আশ্রিত। দাম্পত্য জীবনের পটভূমিকায় শ্যালিকাকে নিয়ে রঙ্গরস ও আসর বিনোদনের আনন্দ যে সে যুগে কিছু কম ছিল, তা নয়।

১। মারিঅ শাসু ননন্দ ঘরে শালী।
মাঅ মারিআ কাহ্ন ভইঅ কবালী ॥ [চর্য্যা ॥ ১ ॥]

[শাশুড়ী, ননদ ও শালীকে মারা হল। মায়াকে জয় করে কাহ্ন কাপালিক হল।]

শশুরা নিদ গেল বহুড়ী আগঅ

[শ্বশুর ঘুমিয়ে পড়ল, বউ জেগে আছে।

একই চর্য্যাগানে কাহ্নপাদ নিচু সমাজে প্রচলিত সাঙ্গার (বিধবা বিবাহ) কথা উল্লেখ করেছেন। এই থেকে অনুমিত হয়, সেযুগে নীচ জাতির মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল। কাহ্নপাদ নিজে একজন উচ্চবর্ণ সম্ভূত ব্রাহ্মণ্যপন্থী তান্ত্রিক ছিলেন। তারানাথের বর্ণনায় এরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাছাড়া নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোকের সঙ্গে কোনরকম ব্যভিচার, নৈতিক অপরাধ বলে গণ্য হত না। 'ব্যভিচার' ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজে একটি তুচ্ছ ঘটনা মাত্র। সামান্য মনস্তাপ করলেই সেই দোষ খণ্ডন করা যেত। ব্যভিচার লিপ্ত কোন রমণী গর্ভবতী হয়ে পড়লে তা নিছক সংসর্গ দোষ বলে ধরা হত। এইরকম ঘটনার অজস্র নিদর্শন ছড়িয়ে আছে চর্য্যাপদের সমকালীন সাহিত্যে—যথা, ধোয়ীর 'পবন দূত' কৃষ্ণ মিশ্রের 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' শ্রীধর দাসের 'সদুক্তি কর্ণামৃত', গোবর্ধনের আর্য্য সপ্তসতী এবং জালালুদ্দিন তাব্রিজির 'সেক শুভোদয়া' গ্রন্থে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কৃষ্ণ মিশ্রের 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাট্য গ্রন্থের একটি ব্যঙ্গ চিত্র এস্থলে উল্লেখ করা যেতে পারে :

নাস্মাকং জননী তথোজ্জ্বলকুলা সচ্ছ্রোত্রিয়ানীং পুনর্
ব্যূঢ়া কাঞ্চন কন্যকা খলুময়া তেনাস্মি ততধিকঃ।
অস্মচ্ছ্যালক ভাগিনেয় দুহিতা মিথ্যাভিশপ্তা যতস্
তৎ সম্পর্কে বশান্ময়া স্বগৃহিণী প্রেয়স্যাপি প্রোজ্ঝিতা ॥

[প্রবোধ চন্দ্রোদয় : দ্বিতীয় অঙ্ক]

['আমার জননী তেমন সৎকুল থেকে আসেনি। আমি কিন্তু সৎ শ্রোত্রিয় বংশের এক কন্যাকে বিবাহ করেছি। তাতে আমি বাবাকে টেক্কা দিয়েছি। আমার শালার ভাগিনেয়র কন্যার নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটনা হওয়ায় সেই সম্পর্কের জন্য প্রেয়সী হলেও গৃহিণীকে আমি ত্যাগ করেছি'—ডঃ সুকুমার সেন : 'প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী] 'প্রকৃত পিঙ্গল' এ অনুরূপ একটি ব্যঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় :

'গজ্জউ মেহ কি অম্বর সামর
ফুল্লউ নীব কি বুল্লউ ভম্বর।

একককউ জীঅ জীঅ পরাহিন অম্মহ।
কীলউ পাউস কীলউ বম্মহ ॥ [প্রাকৃত পিঙ্গল/২।১৪২]

[মেঘগর্জন করুক বা অম্বর শ্যামল হউক বা কদম্ব প্রস্ফুটিত হউক, অথবা ভ্রমর গুঞ্জন করুক ; আমাদের জীবন ত পরাধীন। প্রাবৃট কালই হউক, বা মন্মথই হউক, যে কেউ এই জীবনকে নিপীড়িত করুক।

চর্য্যাগানে রমণী সমাজের চিত্রটি অপেক্ষাকৃত শিথিল। নরনারীর আসঙ্গলিপ্সা, উদ্দাম কামনা ও যৌন শিথিলতার দৃষ্টান্ত সেখানে সুলভ। নীচ জাতীয় রমণীদের সঙ্গে জাতিশ্রেষ্ঠ কুলীনজনেরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিলাস লাস্য করতেন। এর স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় কাহ্নপাদের একটি চর্য্যায়—'অন্তে কুলীনজন মাঝে কাবালী (চর্যা ॥ ১৮ ॥) এমনকি ধর্মাচরণেও ডোমিনীদের সঙ্গী হওয়া কোন দোষের ছিলনা। অনাচারী জাতির রমণী সমাজ ছিল নীতি হীনতায় মলিন। কামান্ধ সমাজপাতরা নিজেদের আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে অনাচারী রমণীদের কুড়ে ঘরের আশেপাশে ঘুরে বেড়াতেন ; 'ছই ছোই যাইসি ব্রাহ্ম নাড়িআ' [চর্য্যা ১৪ ॥ কাহ্নপাদ] ডোমিনীদের রূপ যৌবনে আকৃষ্ট কামান্ধ জনেরা সামাজিক নীতি বন্ধনকে তুচ্ছ করে অনাচার-লিপ্ত হতেন। স্বভাবতই তারা ছিলেন কামপরায়ণ। অনাচারী রমণীদের প্রতি উচ্চবর্ণ সম্ভূত লোকেদের উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি বা স্তুতিগান নগর জীবনের এক রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অতি নির্লজ্জভাবেই তারা এই স্তুতিগান গাইতেন। এর মধ্যে মান সম্ভ্রমের কোন বালাই ছিল না।

১। 'তুলো ডোম্বী হাঁউ কাপলী
তোহার অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী। [চর্য্যা ॥ ১০ ॥ কাহ্নপাদ]

[তুই লো ডোমনী, তোর জন্যে আমি হাড়ের মালা ছাড়লাম।]

২। 'তুঁই লো ডোম্বী সঅল বিটলিউ।
কাজন কারণ সসহর টলিউ ॥ [চর্য্যা ॥ ১৮ ॥ | কাহ্নপাদ]

[ওগো ডোমনী, তোর দ্বারা আমার সবকিছু বিচলিত হল। কাজ নেই, কারণ নেই, তবু সব কাজ টলিয়ে দিল।]

'বৃহস্পতি স্মতি' গ্রন্থে এই মর্মে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, বাঙালী দ্বিজ বর্ণ সমাজের রমণীরা কামপরায়ণা। বৃহস্পতি রচিত উক্ত গ্রন্থটি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতকের রচনা এবং মনুসংহিতারই পরিপূরক। নীচ জাতীয় রমণীরা চর্য্যাকারদের ভাষায় কামচণ্ডালী। সারাক্ষণ তাদের সুরত প্রসঙ্গে কাটে। তাদের যৌবন জালে আবদ্ধ কামাতুর জনেরা দেহজ কামনায় মদির ও উন্মত্ত। কামনা বাসনাময় হৃদয় কেবলই মিথুনলীলায় উৎসাহিত :

অহনিসি সুরঅ প্রসঙ্গে জাঅ।
জোইনি জানের এনি পোহাস ॥
ডোম্বী এর সঙ্গে জো জোই রক্তো।
খনই ন ছাড়অ সহজ উন্মত্তো ॥ [চর্য্যা ॥ ১৯ ॥ | কাহ্নপাদ]

[দিবারাত্র সুরত প্রসঙ্গে কেটে যায়। ডোমনীর সঙ্গে যোগী অনুরক্ত হয়। এক মুহূর্তও সে

(ডোমনীকে ছাড়েনা।]

আসব মত্ততা এবং পরস্ত্রীর প্রতি আসক্তি সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায় ভুসুকু পাদ এবং শবর চর্যাগানে : ণিঅ ঘরিনী-চণ্ডালে লেনী (চর্যা ।। ৪৯ ।।) (নিজ গৃহিণী চণ্ডালে নিয়ে গেল), মহাসুখে বিলসন্তি শবরো লইআ সুন মেহেলী (চর্যা ।। ০ ।।) (মহাসুখে বিলাস করে শবর মেয়ে মহল নিয়ে)। অবৈধ প্রেম এবং আসক্ত লিপ্সার দৃষ্টান্তও কম নেই। এ সম্পর্কের চিত্রগুলি সমসাময়িক জীবন থেকে নেওয়া। সেই জীবন অতি সাধারণ লোকের। সেখানে নরনারীর প্রেমাসক্ত স্বরূপটি এতই বাস্তব যে, সময় সময় গ্রাম্য বলে কুণ্ঠা জাগায়। পুরুষেরা যেমন নিজের গৃহিণী ছেড়ে অন্য রমণীর প্রতি আসক্তি পরায়ণ, তেমনি কুলবধূ কুলের মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে পরপুরুষের সাথে গোপন বিহারে মত্ত :

'দিবসই বহুড়ী কাউই ওরে মাগ অ।
রাত ভইলে কামারত জা অ ।। (চর্যা ।। ২ ।। | কুক্কুরীপাদ)

(দিনের বেলায় বউ কাকের ভয়ে কাঁদে, রাত্রি হলে কামনায় পরিতৃপ্ত হতে যায়।)

এমনও দৃষ্টান্ত আছে, ঘরের মধ্যে শ্বশুর ঘুমিয়ে আছে, কিন্তু বউ এর চোখে ঘুম নেই। মাঝরাতে চোর এসে বউ এর কানেট চুরি করে নিয়ে গেল। শ্বশুর জানতে পারল না, মাঝরাত্রে কী কাণ্ড ঘটে গেল। বউ সেকথা প্রকাশ করতে পারে না। প্রিয় অলঙ্কারটি হারিয়ে তার মুখখানি বিষণ্ণ। কিন্তু সেই চোরের স্বরূপটি কি, তা ঠিক জানা যায় না। সে সত্যিই কি চুরি করতে এসেছিল না পরস্ত্রীর সঙ্গে গোপনে মিলিত হতে এসেছিল, সেকথা বিবেচনা করে দেখতে হয়।

পরস্ত্রীর প্রতি আসক্তি সকল সমাজেই ধিক্কারজনক। কোন রমণীই তা সহ্য করেনা। চর্যাগানের রমণী সমাজ তাই এই কামাচারের প্রতি ধিক্কার জানায় : 'ছাড় ছাড় ম আ বিষমে ছন্দোলী (চর্যা ।(৫০ ।।) (একেবারে ছাড়, মায়া, মোহ, বিষম, ঝঞ্ঝাট)।

চর্যাগানের রমণী সমাজ যেন কামাদুর জনের কারাগৃহ। নীতিভ্রষ্ট সমাজ শুধু বিলাসলম্পট, কামচর্চা ও ইন্দ্রিয় সম্ভোগের স্তুতিগানে মুখরিত। সেখানে কোন আদর্শ নেই,—নেই মানবধর্মে ক্ষীণতম বিশ্বাস। কাহ্নপাদের বর্ণনায়,—এককু ণ কিজ্জই মন্ত ন তন্ত। | ণি অ ঘরিণী লই কেলি করন্ত। (দোহা | কাহ্নপাদ (কোনটাই করে না সে—না মন্ত্র না তন্ত্র। শুধু নিজের গৃহিণীকে নিয়ে ক্রীড়ারসে মত্ত থাকে।

চর্যাপদের ধর্মকথা আদিরসের ছায়ায় রসরূপ লাভ করেছে। সেখানের রমণীসমাজ বিশ্বাস-লাস্যময় রূপে চিত্রিত হলেও সাধক কবিদের ধ্যানধারণা রমণীর স্থূল কামনা বাসনাকে কেন্দ্র করে নয়। মানবাত্মার অন্তর্নিহিত নিত্য সৌন্দর্যাই হচ্ছে প্রকৃত ধর্মীয় উপাচার! সেখানে জৈবিক লালসার কোন স্থান নেই,—আছে শুধু নিরাত্মায় বিলীন হয়ে মহাসুখের উপলব্ধি। সহজানন্দের সাধক কবি তাঁরা। 'মহাসুখ' লাভের উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁদের সাধনা। রমণীকে তাঁরা গ্রহণ করেছেন মহাসুখের সাধনা রূপ। নারী সেখানে দেবী অর্থাৎ নৈরাত্মা দেবী রূপে কল্পিত। সাধক কবিদের মগ্ন হৃদয় সেই দেবী কল্পনায় উৎসারিত।

স মা লো চ না

প্যারী কমিউন : অমলেন্দু সেনগুপ্ত ; মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। ৪/৩,-বি, বঙ্কিম চাটুর্জ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩, পৃঃ ১৯২, দাম : পনেরো টাকা।

মনুষ্যত্বের আর এক নাম মুক্তি। পৃথিবীতে যেথনে দেখা গেছে মনুষ্যত্বের অবমাননা, অসম্মান সেখানেই মুক্তির স্বপ্ন দেখছে মানুষ, মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠায় জোট বেঁধেছে নিপীড়িত, লাঞ্ছিত মেহনতী মানুষের দল। নিজস্ব রাষ্ট্র কর্তৃত্বের প্রয়াস দেখা গেছে তাদের। ইতিহাস যেসব কথা সোনার কলম দিয়ে লিখে রেখেছে তার বুকে। ভোলবার নয় সেসব কথা। প্যারীর শোষিত মানুষের মুক্তির অভিযান ও তার অল্পাধিক দু'মাসের লোককেন্দ্র প্রতিষ্ঠার অসমসাহসিক কীর্তি বিস্মৃত হবার নয়। ১৮৭১ সালের ফরাসী ইতিহাস প্যারী কমিউনের এই কীর্তি সোনা দিয়ে মুড়ে রেখেছে। তার উজ্জ্বল্যে চোখ ঝলসে যায়। মনেপ্রাণে শোষিত মানুষের অবিনশ্বর মনুষ্যত্বের সঙ্গে সাক্ষাতকার ঘটে আমাদের।

প্যারী কমিউন সর্বহারা মানুষের বৈপ্লবিক চেতনার একটি বহ্নিশিখা—একটি ভয়াবহ আগ্নেয়গিরি। এই আগ্নেয়গিরির বহ্ন্যুৎসবের ইতিকথাই বিবৃত হয়েছে সম্প্রতি বাংলা ভাষায় প্রণীত 'প্যারি কমিউন' গ্রন্থে। লেখক অমলেন্দু সেনগুপ্ত ইতিহাসের অধ্যাপক। প্যারী কমিউন সম্পর্কিত বহু গবেষণামূলক গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রকে ভিত্তি করে তাঁর বিষয়কে যথাসম্ভব প্রামাণ্যও করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন। পরিবেশনের গুণে গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে উপাদেয় হয়েছে। অথচ রম্য-রচনার হাল্কা-চপলতার কোনো পরিচয় গ্রন্থে প্রকাশ পায়নি। এ প্রসঙ্গে লেখকের নিজস্ব উক্তির সঙ্গে ঐক্যমত পোষণে দ্বিধা নেই—'প্যারী কমিউন নিয়ে কোনো নাটকীয় রম্যরচনা করতে চাইনি। ঠিক তেমনিভাবেই একে করে তুলতে চাইনি গুরুগম্ভীর গবেষণাগ্রন্থ।'

কমিউন শব্দটির অনেক ব্যঞ্জনা। এর নেপথ্যে আছে অনেক প্রসঙ্গ ও বক্তব্য। ১৭৯ সালে প্যারীতে যখন প্রথম ঘটে দরিদ্র মানুষের অধিকার-প্রতিষ্ঠা, তখন থেকেই প্যারী কমিউন শোষিত জনগণের মুক্তিপথের দিশারী। প্যারী চিরদিনই ফরাসী দেশের মুক্তিপিয়াসী মানুষের মহাতীর্থ। সাম্যবাদী আন্দোলনের যেন ঝরণাতলা এই ফরাসী দেশ। জনগণের অধিকার অর্জনের আন্দোলনে ফরাসী দেশ সমগ্র বিশ্বে একদিন নেতৃত্ব দিয়েছে, সেকথা অন্য কেউ অস্বীকার করে না। মহান্ ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ ও কর্মপন্থা একদিন সারা বিশ্বের মুক্তি পিয়াসী মানুষকে নতুন স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ করেছে। সেসব বিরাট কর্মবহুল ঘটনার বিবরণ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। 'প্যারী কমিউন' গ্রন্থে প্রথম পর্বে লেখক অধ্যাপক সেনগুপ্ত ১৮৭১-র প্যারী কমিউনের প্রলেতারীয় রাষ্ট্র-নির্মাণের সোপান হিসাবে ফরাসী দেশের বিভিন্ন আন্দোলন ও ঘটনাপ্রবাহ অতি মনোরম ভঙ্গিতে বিবৃত করেছেন। ঐতিহাসিক নানা তত্ত্ব ও তথ্যের স্তূপে ফেলে তিনি পাঠককে কোনসময়েই দিশাহারা করেননি। মূল বিষয়ের প্রতি সযত্নে ও অত্যন্ত সুকৌশলে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে রেখেছেন।

প্যারী কমিউনের প্রতি লেখকের সহৃদয়তা ও গভীর আন্তরিকতা এমন সহজে পাঠকমনে সঞ্চারিত হয়েছে যে ইতিহাসের নীরস বিষয়বস্তু সাহিত্যের রসসামগ্রীতে পরিণত হয়েছে যার তুলনা মেলে না ইদানীং কালের কোনো রচনায়।

১৮৭১-এ কমিউনের নেতৃত্বে প্যারীর মানুষদের যে যুগান্তকারী অভ্যুত্থান ও ধনতন্ত্রী শাসনের বিরুদ্ধে অসমসাহসিক সংগ্রামের ফলশ্রুতি হিসাবে ক্ষমতাবাদী সরকারের যে সাময়িক পতন, তা গ্রন্থটির দ্বিতীয় পর্বে অধ্যাপক সেনগুপ্ত বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। কমিউনের স্বরূপ ও তার যথার্থ চরিত্র সুন্দরভাবে এই পর্বের দ্বাদশ অধ্যায়ে পরিস্ফুট হয়েছে। সমস্ত চিন্তাধারার মানুষই কমিউনে স্থান পেয়েছে। .....রয়েছেন নৈরাজ্যবাদী, বোহেমিয়ান, বিক্ষুব্ধ পেটিবুর্জুয়া, শ্রেণীচ্যুত, আর যাদের কোনশ্রেণীতে ফেলা যায় না এরকম মানুষ—সকলকে নিয়েই কমিউন। ১৮৭১-র সালে প্যারীর অভ্যুত্থান সারা ফরাসী দেশের মানুষকে টেনেছিল এক দূর প্রসারী বিপ্লবের আবর্তে। দেশের মুক্তি আর জনগণের মুক্তি একাকার হয়ে এক সুমহান মনুষ্যত্বে মুক্তিযজ্ঞের যে এক লেলিহান শিখা জ্বলে উঠেছিল তারই অসংখ্য চিত্র অধ্যাপক সেনগুপ্ত ঐতিহাসিক, সাংবাদিক, চিত্রশিল্পী, গীতিকার, শিক্ষাবিদ্ ও চিকিৎসকের ক্যামেরায় অপূর্ব সুন্দরভাবে ধরে রেখেছেন। প্যারী কমিউনের এমন সর্বাঙ্গীণ রূপগুচ্ছ রচনার জন্য অমলেন্দুবাবু বাঙ্গালী পাঠক সমাজের কাছে যে প্রশংসাভাজন হবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শিল্পী খালেদ চৌধুরীর প্রচ্ছদ, পরিশিষ্টে অবন্তী সান্যালকৃত মূল ফরাসী থেকে প্যারী কমিউনের ঐতিহাসিক দলিলের বাংলা অনুবাদ ও গ্রন্থ তালিকা অবশ্যই গ্রন্থটির ব্যবহারিক মূল্য অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।

অধীর দে